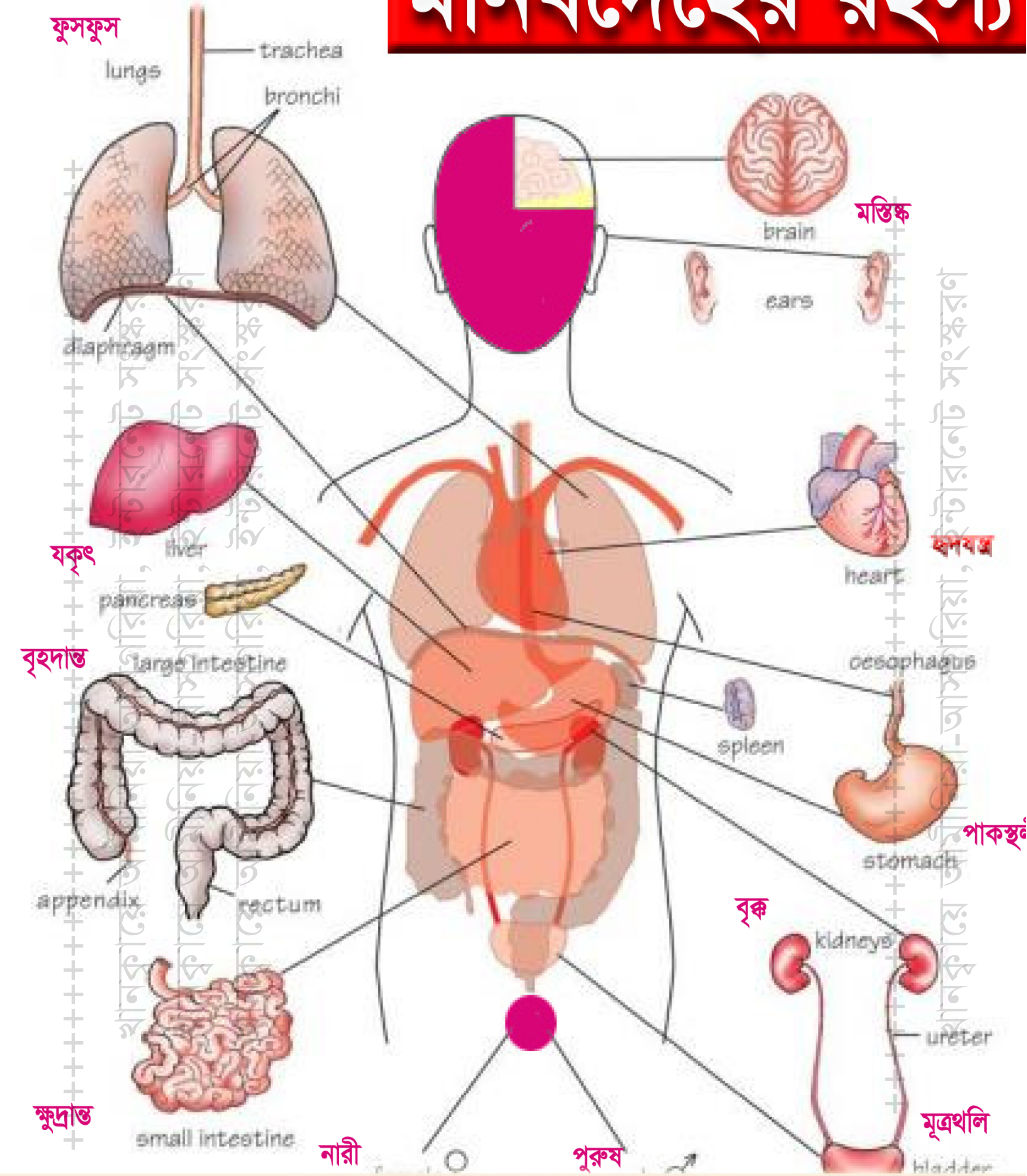
মানবদেহের রহস্য



ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সিলেট।

মানবদেহের রহস্য

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনার একটি অঙ্গসংগঠন

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

মানবদেহের রহস্য

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

দু'টি কথা

আলহামদুলিল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা মহান প্রভু আল্লাহর জন্য যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির খিদমতে। যার অনুগ্রহ ও দয়ার শেষ নেই। মহাকাশ ও পৃথিবীকে প্রাণীজীবন বেঁচে থাকার যোগ্য করে তোলার পর তিনি পয়দা করেছেন সৃষ্টির সেরা মানবজাতি। অত্যাশ্চর্য পরিকল্পনা ও কৌশল দ্বারা মানুষের দেহকাঠামো সাজিয়েছেন। এর উপর গভীর গবেষণা করলে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

আমাদের দেহটি যে কী অপূর্ব কৌশলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তা সঠিকভাবে ঈমানী নূরে অনুধাবন করলে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারি। আগের যুগে এই লাইনে গবেষণা ও এ থেকে আধ্যাত্মিক ফায়দা লাভের বিজ্ঞানকে বলা হতো 'দেহতত্ত্ব'। ঠিক এরূপ আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাসাওউফের অনুসারী সালিকীন এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তবে সাধারণ পাঠকরাও মানবদেহের অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য হাসিলে উৎসাহিত হবেন এটাও আশা করা যায়।

যে কোন রচনায় ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। আমরা মানুষ! সর্বদা সঠিক ও যথার্থ সবকিছু করা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই ভুল-ত্রুটি যদি কারো চোখে ধরা পড়ে তাহলে জানিয়ে বাধিত করার একান্ত অনুরোধ রইলো পাঠকবৃন্দের প্রতি। আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ! সবশেষে আমি মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি- কারণ তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ও ইচ্ছা ছাড়া মানুষের জন্য কল্যাণময় কিছু লিখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এই গ্রন্থ থেকে যদি পাঠকদের কিছুটাও উপকার সাধিত হয় তাহলে আমার পরিশ্রমটুকু স্বার্থক হবে। আমি আশাকরি মহান প্রভু কাল কিয়ামতের কঠিন সময়ে আমাকে এই গ্রন্থটির ওয়াসিলায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। গ্রন্থটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা ছাড়া এটি আদৌ পাঠকমণ্ডলীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হতো না। আল্লাহ পাক সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

- গ্রন্থকার

বিষয়সূচি

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কুরআন শরীফে আদম (আঃ) সৃষ্টির বর্ণনা

আপনার আমার দেহ আর আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর দেহের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই- এটাই আমরা মনে করি। হযরত আদম (আঃ) এর দেহ থেকেই সকল মানবদেহের উৎপত্তি। লক্ষণীয় যে, বিশুদ্ধ মতে আমাদের আদি মাতা বিবি হাওয়া (আঃ) এর দেহও সৃষ্টি হয়েছিল আদম (আঃ) এর দেহ থেকে। আমি লক্ষণীয় বলার কারণ হলো, আজকের বিজ্ঞানও এভাবে একজন 'বয়স্ক' নারী বা পুরুষের দেহ থেকে কোষ বের করে তা দিয়ে নতুন প্রাণী সৃষ্টির পন্থা আবিষ্কার করেছে। এই পন্থার নাম 'ক্লোনিং'। অত্যাধুনিক এই কৌশলের কথা গ্রন্থের শেষের দিকে বর্ণিত হবে। প্রথমে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে শত শত কোটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত আদমের (আঃ) দেহ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। আর এই বর্ণনার মূল সূত্র হচ্ছে মহান ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন।

আদম-সৃষ্টির আগেই সমগ্র মহাবিশ্বসহ আমাদের এই পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থ সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর একটি বিশেষ কারণও আছে আর তাহলো আদমের মতো দেহ ও রূহবিশিষ্ট একজন প্রাণী ও তাঁর বংশধরদের অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো উপযোগী একটি বস্তুসর্বস্ব সৃষ্টি-কাঠামোর দরকার। কোষের সমন্বয়ে গঠিত আদম ও তাঁর সন্তানাদির দেহ যাতে সবদিক থেকে উপযোগী একটি গ্রহে বসবাস করতে পারে সে ব্যবস্থা আগেই করে নিলেন মহান রাব্বুল আলামীন। সুতরাং আমাদেরই প্রয়োজন মেটাতে সৃষ্টি হয়েছে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে যথার্থভাবে।

বস্তুজগতকে সঠিকভাবে সাজানোর পর মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর মাটিতে বৃক্ষ-তরু-লতা এবং অসংখ্য জীব-জন্তুর আবির্ভাব ঘটালেন। এসব জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জীবন কোটি কোটি বছরব্যাপী এই গ্রহের উপর বসবাস করে একে একে অনেকেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এসব জন্তু ও উদ্ভিদ মাটির গভীরে

পৌঁছে পচে-গলে তৈল, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে পরিণত করা হলো যাতে এগুলো দ্বারা ভবিষ্যৎ আদমসন্তানরা নিজেদের এনার্জি চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এছাড়া বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু প্রজাতিও সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকের মতে জিন জাতীয় প্রাণীরা আদম সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই এই গ্রহের অধিবাসী হয়। আধুনিক যুগে 'নৃতত্ত্ব' নামক একটি মানবজাতির উপর গবেষণামূলক বিজ্ঞানের জন্ম নিয়েছে। এতে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক মানবজাতির পূর্বে আরো একাধিক জাতি এই ধরার বুকে বাস করেছে যাদের অবয়ব ও দেহকাঠামো অনেকটা মানুষের মতোই ছিলো। তবে এরা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফ থেকেও আদমের পূর্বে এখানে অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব ছিলো বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদম সৃষ্টির বর্ণনা দিতে যেয়ে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি; তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। [সূরা বাক্বারা : ৩]"

এখানে ফেরেশতাগণ কেনো প্রশ্ন করলেন, 'সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"। ফেরেশতাগণ গায়েবের খবর জানেন না- বস্তুত একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া কেউই গায়েব সম্পর্কে অবগত নয়। তবে হ্যাঁ, যেটুকু যাকে ইচ্ছা আল্লাহ অনুগ্রহ করে অবগত করে থাকেন, শুধু সেটুকুই কোন ব্যক্তি গায়েব সম্পর্কে জানতে পারেন। ফেরেশতাদের এই প্রশ্নের কারণ ছিলো, পৃথিবীতে ইতোমধ্যে অর্থাৎ আদম (আঃ) সৃষ্ট হাওয়ার পূর্বে এক বা একাধিক জাতি ছিলো যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও

হানাহানি করতো আর সম্ভবত এ কারণেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ফেরেশতারা ওসব ধ্বংসলীলা অবলোকন করেছিলেন তাই প্রশ্ন করে বসলেন, আরেক বুদ্ধিমান জাতির আবির্ভাব ঘটবে ও তারা আল্লাহর নাফরমানি ও মারামারি-কাটাকাটি করে ধ্বংস হবে। সুতরাং ইবাদত করার প্রাণী হিসাবে তো আমরাই আছি, অতীতের মতো অবাধ্য আরেক জাতি সৃষ্টির প্রয়োজন কি?

আদম-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌পাকের পরিকল্পনায় ছিলো যা ফেরেশতারা অবগত ছিলেন না। আর এই কারণেই তারা মনে করেছিলেন, আগের জাতিদের মতো মানুষ (খলীফা) নামক আরেক জাতি সৃষ্ট হচ্ছে- এতে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে- তা তাদের ধারণায়ই আসে নি। তবে আদমের দেহকাঠামো অতীতের মানব-সদৃশ প্রাণীদের অনুরূপ ছিলো বটে কিন্তু এতে সংযোজিত হয় বিশিষ্ট উপাদান যা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন সৃষ্টি। মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীদের দেহ যদিও অনুরূপ কোষের দ্বারা সৃষ্ট কিন্তু মানুষের মতো তাদের মধ্যে মানবাত্মা বহন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। অন্য কথায় আদম (আঃ) এর দেহের বৈশিষ্ট্য এমন হলো যে, এতে আল্লাহর পবিত্র ফুৎকার দ্বারা সৃষ্ট অবস্তুর তৈরী সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ আত্মা বা রূহ অবস্থান করার যোগ্যতা অর্জন করলো।

আদম (আঃ) এর মধ্যে যে আলাদা গুণাবলী দেওয়া হয়েছিলো এবং এ কারণে তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হলেন তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত এসেছে। [দেখুন সূরা বাক্বারা আয়াত ৩০ থেকে ৩৪]

মানবদেহের কাঠামো

এই গ্রন্থে মানবদেহের ডিজাইন সংক্রান্ত অপূর্ব কৌশলের উপর আলোচনা হবে। তবে যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবদেহ সম্পর্কে গবেষণা হয় তাকে বলে চিকিৎসা শাস্ত্র। সুতরাং গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদি এই শাস্ত্র থেকেই এসেছে। মানবদেহের বিভিন্ন অংশের উপর কোন তথ্যই ধারণাপ্রসূত নয়- বরং বিজ্ঞানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত জানা বিষয় থেকে তা সংগ্রহিত। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, কী অপূর্ব কৌশলে মানবদেহ তৈরী করেছেন মহান আল্লাহ পাক তা অনুধাবন করা। এ থেকে আমরা ঈমানী শক্তিতে আরো বলীয়ান হতে পারি। দ্বীনের প্রতি আমাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে- এটাই আশা। এবার লক্ষ্য করুন, আপনার আমার দেহকাঠামোর বর্ণনা এবং নিশ্চয়ই আপনি এসব তথ্য জেনে বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবেন না।

আমাদের দেহকে জীবিত রাখার জন্য ক্ষুদ্র কিছু অংশ বানানো হয়েছে। এসব অংশের নাম কোষ। দেহের সবকিছু মূলত এই কোষের তৈরী। কোষকে তাই আল্লাহ পাক এমন সুচারুরূপে তৈরী করেছেন যে, তা জানার পর সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। প্রতিটি কোষ কিন্তু জ্যান্ত একেকটি ইউনিট।[১] এগুলোর সমন্বয়ে মানবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন: মস্তিষ্ক, হাড্ডি, রক্ত, হৃদযন্ত্র, শিরা-উপশিরা, ফুসফুস, যকৃৎ (লিভার), পাকস্থলী, মূত্রগ্রন্থি (কিডনি), মূত্রথলি (ব্লাডার), বড় ও ছোট্ট অন্ত্র (ইনটেস্টিন), চামড়া, জিহ্বা, চুল, হাত, পা, বুক, পিঠ ইত্যাদি সবকিছু গঠিত। সুতরাং মানবদেহকে বাঁচিয়ে রাখার মানেই হলো প্রতিটি কোষকে বাঁচানো- এরপর এগুলো মরে গেলে নতুন কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি জরুরী। কোষের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি যন্ত্র কিন্তু আলাদা আলাদা কাজে নিয়োজিত আছে। আমাদের চেতনা বহির্ভূত অনেক

[১] মানব কোষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমার রচিত, 'জীবন্ত কোষ: পরিচিতি ও কার্যকারিতা' শিরোনামের গ্রন্থটিতে। বইটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেহের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে যা দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একান্ত জরুরী।

কোষকে বাঁচানোর জন্যই সকল আয়োজন। কারণ এগুলো দ্বারা যাবতীয় দেহাংশ সৃষ্ট। আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো কোষে কোষে (শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে নেওয়া) অক্সিজেন নামক গ্যাস পৌঁছে দেওয়া এবং কোষ থেকে বহিস্কৃত বর্জ্য হিসাবে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস নিয়ে এসে বাইরে (নিঃশ্বাসের মাধ্যমে) নির্গত করা। রক্তের মধ্যে অনেক কোষ আছে যেগুলো এই কাজটি সারে। এসব কোষের নাম হিমোগ্লোবিন (লাল রক্তকোষ)।[২]

মানবদেহের কাঠামোকে কয়েকটি আলাদা তন্ত্র বা সিস্টেমে বিভক্ত করে দেখলে ব্যাপারটি বুঝা আমাদের নিকট সহজ হবে। আমি যেটুকু সম্ভব ডাক্তারী বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবো। সাধারণ ভাষায় প্রতিটি তন্ত্রের কাজ বর্ণনা করবো। প্রথমে সবগুলো সিস্টেমের একটি তালিকা উল্লেখ করছি।

১. কঙ্কালসার; ২. পেশী; ৩. চামড়া; ৪. শ্বাস-নিঃশ্বাস; ৫. রক্ত চলাচল; ৬. পরিপাক; ৭. মূত্রতন্ত্র; ৮. পুনর্জনন; ৯. রোগ প্রতিরোধ; ১০. স্নায়ুতন্ত্র এবং ১১. উদ্দীপক রস (হর্মোন)।

এই **১১**টি মৌলিক তন্ত্র একত্রে মিলে সর্বদা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমাদের দেহকে হায়াত যতোদিন আছে ততোদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখে। আর দেহ বেঁচে থাকার অর্থই হলো এখানে 'আত্মা' সম্পৃক্ত থাকা। আত্মাকে এই দেহে 'বন্দী' রাখার জন্যই সকল আয়োজন। মাত্র সত্তুর কিংবা আশি বছরের জীবনের জন্য আল্লাহ পাক যে জটিল কৌশলে দেহকে বানিয়েছেন তা উপলব্ধি করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এতো সুচারু কাঠামো, এতো শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ! কিন্তু এর স্থায়িত্ব এতো অল্পদিন? যা হোক এবার উপরে উল্লেখিত প্রতিটি তন্ত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

---

[২] রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকলেই বলা হয় 'দেহের মধ্যে রক্ত কমে গেছে'। হিমোগ্লোবিন সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় আয়রন বা লৌহজাত দ্রব্য।

১. মানব কঙ্কালসার

প্রতিটি তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত আছে এক বা একাধিক দেহযন্ত্র। মানব কঙ্কালের মূলে আছে হাড্ডি। পুরো দেহকে বহন ও পরিচালনার জন্য যোগ্য একটি শক্ত কাঠামোর প্রয়োজন। আল্লাহ্ পাক অপেক্ষাকৃত শক্ত বিভিন্ন ধরনের হাড্ডির সমন্বয়ে আমাদের দেহের কাঠামো তৈরী করেছেন। শক্তিশালী একটি পাকা গৃহ তৈরীর জন্য যেভাবে আরসিসি নির্মিত 'কঙ্কাল বা ফ্রেম' প্রথমে নির্মাণ করে তার উপর ইটের গাঁথুনি, আস্তর, রং, কাঠের ফ্রেম তথা দরজা-জানালা ইত্যাদি দ্বারা ঘরটি সম্পন্ন করতে হয়। ঠিক তদ্রূপ, মানবদেহকে কঙ্কাল দ্বারা সার্বিক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। যাতে এর উপর পেশী ও ভেতরের যাবতীয় দেহযন্ত্র রাখা যায়। আমাদের কঙ্কাল আমাদেরকে শুধু চলাচলেই সাহায্য করে তা-ই নয়, এটা বিভিন্ন জরুরী দেহযন্ত্রকে নিরাপত্তা দানও করে।

সর্বমোট ২০৬ টি ছোটবড় হাড্ডির সমন্বয়ে কঙ্কাল কাঠামো তৈরী। এসব প্রতিটি হাড্ডির উপর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মৌলিক কয়েকটি হাড্ডির কাঠামো নিয়ে আলোচনা করলেই কঙ্কালসারের গুরুত্ব অনুধাবন হবে।

মানব মাথার খুলি

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মাথার খুলি (human skull) দু'টি অংশে বিভক্ত। উপরের অংশ যার ভেতর মস্তিষ্ক থাকে এবং নিম্নের মুখের অংশ। উপরের অংশ মস্তিষ্ককে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং মুখের শক্ত পেশী যেমন মানবদেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী চোয়াল পেশীকে নীচের মুখাবয়বের হাড্ডি সাপোর্ট দেয়। মানব খুলির মধ্যে মোট ২২টি হাড্ডি আছে। উপরের অংশে আছে ৮টি ও নীচের অংশে ১৪টি। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির মগজের আয়তন বেশ বড়ো। মায়ের গর্ভে থাকাকালে মগজটি পুরোদমে বড় হতে দেওয়া হয় না- কারণ, মাথার আয়তন বেশী বড়ো হয়ে গেলে প্রসব সমস্যা দাঁড়াবে। সুতরাং মাথার খুলি জন্মের পরও যাতে বাড়তে পারে-

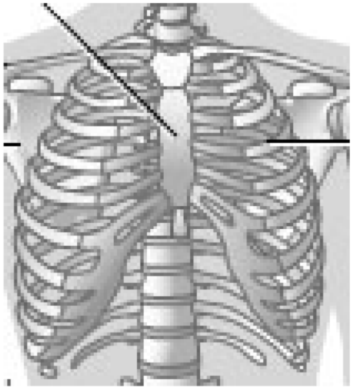
ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া মগজের সুবিধার্থে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জন্মের পর ১৮ মাস বয়স হওয়ার পর বাচ্চাদের মাথার খুলি সম্পূর্ণ জয়েন্ট হয়।



মানব মাথার খুলি

পাঁজর পিঞ্জর

আমাদের পাঁজর পিঞ্জর (rib cage) ১২ জোড়া বক্র হাড্ডি দ্বারা সৃষ্ট। মেরুদণ্ড থেকে এগুলো গজে উঠে পুরো বক্ষদেশকে ঘিরে রাখে। এর ফলে দেহাভ্যন্তরের অরগ্যান বা যন্ত্রগুলো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। উপরের সাত জোড়া পাঁজর হলো আসল পাঁজর- কারণ, এগুলো বক্র হয়ে বক্ষের হাড্ডির সাথে যুক্ত হয়েছে। বাকী পাঁচটি হলো নকল পাঁজর। এর মধ্যে উপরের তিন জোড়া হাড্ডি পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ও অপর (সামনের) দিকে প্রতিটি পাঁজর এর উপরের পাঁজরের উপাস্থি বা কার্টিলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাকী দুই জোড়া নকল পাঁজরকে ভাসমান পাঁজরও বলে। এর কারণ হলো, এগুলো শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের সাথে সংযুক্ত।



আমাদের পাঁজর পিঞ্জর

মেরুদণ্ড

মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী। ৩৩টি আলাদা হাড্ডি দ্বারা সৃষ্ট এই মেরুদণ্ড ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত লম্বা। এটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, চেইনের মতো বক্র হওয়ার যোগ্যতা এতে থাকায় আমরা নিজেদের পায়ের অঙ্গুলি স্পর্শ করতে সক্ষম হই। আর কৌশলে তৈরী এই মেরুদণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো স্নায়ু টিস্যুসর্বস্ব আমাদের মেরু রজ্জুকে নিরাপত্তা প্রদান। মেরু রজ্জু মস্তিষ্কের নিম্নাংশ থেকে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে কোমর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। মেরু রজ্জু ও মগজ মিলে সৃষ্ট হয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র।



মানব মেরুদণ্ড

ইংরেজী অক্ষর ‘S’ এর মতো মেরুদণ্ড আমাদের দীর্ঘকায় দেহের যাবতীয় ওজন পায়ের পাতার উপর নিয়ে পতিত করে। এর ফলে আমরা দাঁড়াতে, হাটতে, নাচতে, লাফ ও দৌড়াতে পারি। মেরুদণ্ড যদি সোজা

শক্ত পাইপের মতো হতো তাহলে আমাদের চলনশক্তি সীমিত হয়ে পড়তো। আর এ কারণেই চতুষ্পাদ জন্তুর মেরুদণ্ড অনেকটা সোজা। চার পায়ের উপর ওজন সঠিকভাবে পতিত হতে তাদের মেরুদণ্ড বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কোমর ও নিতম্বের অস্থিকাঠামো

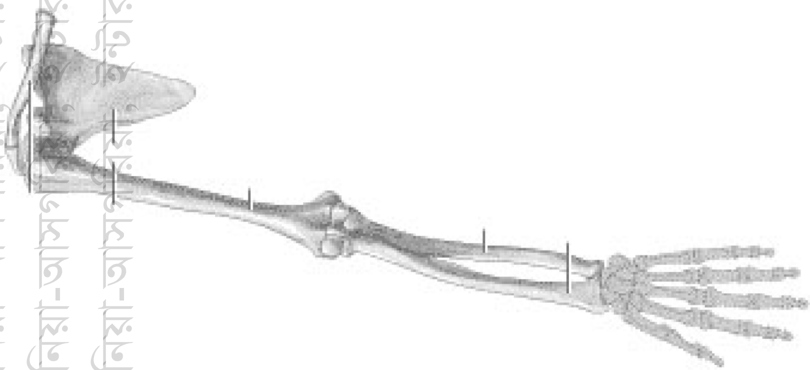
এই অস্থিকাঠামোকে ইংরেজীতে পেলভিস (pelvis) বলে। পেলভিসের উভয় দিকে ও সামনে আছে আমাদের কটি-হাড্ডি। দেহের ওজন মেরুদণ্ড থেকে পেলভিসের কটি-হাড্ডিতে এসে পতিত হয় ও সেখান থেকে উরু-হাড্ডি হয়ে পায়ের পাতার হাড্ডিগুলোর উপর যেয়ে পৌঁছে। পেলভিস আমাদের ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও তলপেটের অভ্যন্তরের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রান্ত্র, মলনালী, মূত্রথলি এবং পুনর্জননের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভ্যন্তরীণ দেহ যন্ত্রাদিকে নিরাপত্তা প্রদান করে। নারীদের পেলভিস পুরুষের তুলনায় কিছুটা চওড়া এবং অতিরিক্ত গোলাকারও। তাদের পেলভিসের হাড্ডিসমূহ কিছুটা কম ওজনবিশিষ্টও। এভাবে ডিজাইনের ফলেই নারীরা তাদের গর্ভাশয়ে দীর্ঘ ৯ মাসেরও অধিক সময়ব্যাপী ক্রমে বেড়েওঠা সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হোন। এছাড়া শিশু প্রসবের সময় এই বিশেষ ডিজাইন অনেকটা সহায়ক। আল্লাহ পাক তার বান্দা-বান্দীকে সবদিক বিবেচনা করে সৃষ্টি করেছেন। মানব দেহের প্রতিটি অংশ বিশেষ কারণ হেতু সৃষ্ট। এই গ্রন্থে আমরা একে একে এসব ব্যাপার জানতে পারবো।



মানব পেলভিস

বাহু ও হাতের হাড্ডি

উপরিস্থ বাহুর মধ্যে আছে একটি দীর্ঘ হাড্ডি যার নাম হিউমারাস (humerus)। একে বাংলায় প্রগণ্ডাস্থি বলে। কনুই থেকে স্কন্ধসন্ধি পর্যন্ত লম্বা এই বাহুর অস্থির উপরের শেষভাগ গোলাকার। এই অংশ সুন্দরভাবে স্কন্ধের হাড্ডির সঙ্গে সংযুক্ত আছে, যাতে আমরা হাতটি চতুর্দিকে নাড়াতে সক্ষম হই। এই জয়েন্টকে বলে বল-এবং-সকেট। এটির বৈশিষ্ট্য হলো চক্রাকার চলনকে নিশ্চিত করা। আমরা বিভিন্ন ধরনের হাড্ডির জোড়ার উপর একটু পরই আলোচনা করবো।



কনুই থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত বাহুর অংশে দু'টি লম্বা হাড্ডি আছে। কনুইয়ে উপরের হাড্ডির সঙ্গে একটি বিশেষ জয়েন্ট আছে, একে বলে হিঞ্জ জয়েন্ট। এই জয়েন্ট অনেকটা দরজার কজার মতো। বাহুর নিম্নাংশের এই লম্বা দু'টি হাড্ডির একটির নাম 'আলনা'। এই হাড্ডিটি অনড় অবস্থায় যুক্ত আছে। কিন্তু অপর 'রেডিয়াস' নামক হাড্ডি ঘুরতে পারে। আর এই কারণে আমরা একটি স্ক্রু ড্রাইভারকে ঘুরাতে সক্ষম হই।

আমাদের হাতের ডিজাইন সত্যিই অপূর্ব! বস্তুকে ধরাসহ হাতের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য এই জটিল কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। আমাদের চতুর্পার্শ্বস্থ মানবসৃষ্ট কৃত্রিম সবকিছুর

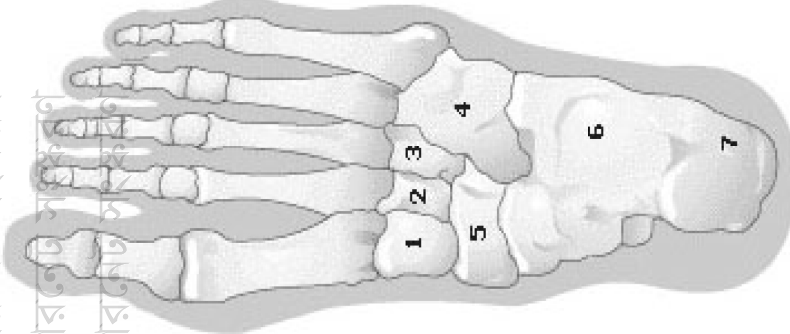
মূলে এই কৌশলই ক্রিয়াশীল ছিলো এবং আছে। কারণ, সকল প্রযুক্তির মূলে বহু-কাজ-সম্পাদনে-দক্ষ আমাদের হাতই জড়িত। সুতরাং হাতকে আল্লাহ পাক এভাবে জটিল করে বানানোর মূলে প্রথমেই কতগুলো হাড্ডি দ্বারা তার কাঠামো তৈরী করেছেন। এসব হাড্ডির মাধ্যমে সকল ধরনের চলন নিশ্চিত হয়েছে।

কব্জির জয়েন্ট দ্বারা হাতের হাড্ডিগুলো উপরের বাহুর হাড্ডির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অপরদিকে পাঁচটি অঙ্গুলির হাড্ডিসমূহকে নীচের দিকে হাতের তালুর হাড্ডির সঙ্গে সংযুক্ত করানো আছে। মানব হাতে সর্বমোট ২৭টি হাড্ডি আছে। এর মধ্যে ৮টি আছে কব্জিতে যা ৪টি করে দু'টি লাইনে সারিবদ্ধভাবে সাজানো, প্রত্যেক অঙ্গুলির জন্য একটি করে ৫টি লম্বাটে হাড্ডি হাতের তালুতে আছে এবং বাকী ১৪টি হাড্ডি আমাদের ৫টি অঙ্গুলিকে সাজিয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি হাড্ডি আছে এবং বাকী অঙ্গুলিসমূহ তিনটি করে হাড্ডি দ্বারা সৃষ্ট। দুই সেট পেশী ও শক্ত তন্তুর মাধ্যমে হাতের নড়াচড়া নিশ্চিত হয়। মোটকথা মানুষের হাতের হাড্ডি, পেশী ও টেনডন ইত্যাদি মিলে হাতকে শত শত ভিন্ন চলনশক্তি প্রদান করেছে। এর ফলেই আমরা খুব জটিল অনেক নির্মাণ যন্ত্রপাতি অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারি।

পা ও পায়ের পাতার হাড্ডি

পায়ের মধ্যে মোট ৪টি হাড্ডি আছে। উপরের অংশে তথা উরুর মধ্যে যে হাড্ডিটি আছে এটিই হলো মানবদেহের সর্বাপেক্ষা শক্ত ও দীর্ঘতম অস্থি। এই অস্থির নাম ঊর্বাস্থি (femur)। কটি অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত ঊর্বাস্থির উপরের শেষাংশ গোলাকার। সেখানে আছে বল-এন্ড-সকেট জয়েন্ট। ফলে আমরা পুরো পাকে ঘুরাতে সক্ষম হই। মুক্তভাবে ঘুরানোর সুবিধাসহ এরূপ জয়েন্টের আরেক গুণ হলো দেহের ওজনকে সঠিকভাবে ঊর্বাস্থিতে ছড়িয়ে দেওয়া। নীচের দিকে ঊর্বাস্থি হাঁটুর মধ্যে যেয়ে জঙ্ঘাস্থির (shinbone) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেখানের জয়েন্টটিকে বলে কব্জা জয়েন্ট। ফলে আমরা আমাদের পায়ের নিম্নভাগ তথা হাঁটুর নীচের অংশ কব্জা-দরোজার মতো নড়াচড়া করতে পারি। এই গুরুত্বপূর্ণ

জয়েন্টটিকে অপর আরেক টুকরো ছোট্ট হাড্ডি দ্বারা নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। ত্রিভুজের আকারে তৈরী এই হাড্ডির নাম মালাইচাকি (patella)।



আমাদের পায়ের পাতার হাড্ডি

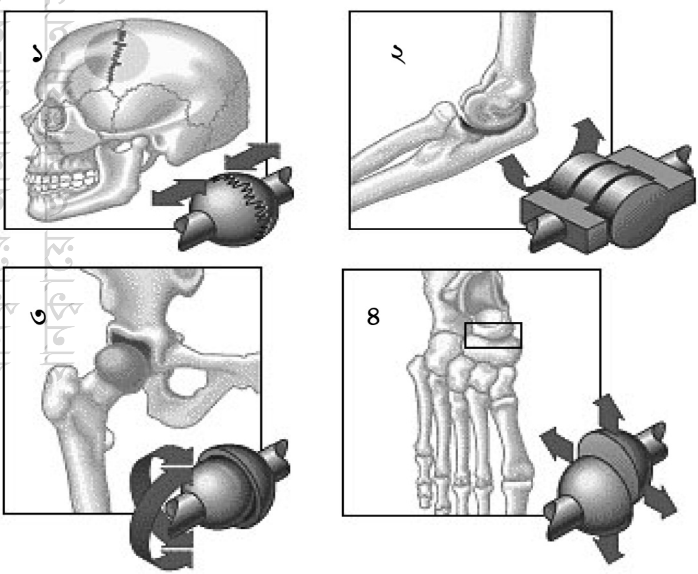
আমাদের হাঁটুর নীচে দু'টি দীর্ঘ হাড্ডি আছে। এর মধ্যে যেটি বড় তার নাম টিবিয়া (tibia)। এটি পায়ের সামনের দিকে অবস্থিত। দ্বিতীয় অস্থিটির নাম ফিবুলা (fibula)। এটা অপেক্ষাকৃত ছোট্ট এবং এর অবস্থান পায়ের এক প্রান্তে। ফিবুলার উপরের শেষাংশ টিবিয়ার সঙ্গে হাঁটুর নীচে যুক্ত হয়েছে। অপরদিকে ফিবুলা ও টিবিয়া পায়ের গুল্‌ফে যেয়ে গুল্‌ফ-হাড্ডির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর গুল্‌ফে আছে একটি কব্জা জয়েন্ট।

আমাদের পায়ের পাতা দেহের তুলনায় অনেক ছোট্ট হলেও এরই মাধ্যমে আমরা দাঁড়াই, হাঁটি, ব্যায়াম করি, দৌড়ি, লাফ দিই ও নাচতেও পারি। সুতরাং পায়ের পাতার অস্থির কাঠামোও অত্যন্ত সুচারুভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক। সর্বমোট ২৬ খানা হাড্ডি দ্বারা পায়ের অস্থিকাঠামো সৃষ্ট। এর মধ্যে ৭টি গাঢ়, বেটে হাড্ডি পায়ের পাতার গোড়ালিতে আছে। আমাদের দেহের অধিকাংশ ওজন পায়ের পাতার পশ্চাদ্‌ভাগ তথা এই গোড়ালিতে যেয়ে পতিত হয় তাই এই ব্যবস্থা। এখান থেকে ৫টি সমান্তরাল হাড্ডি চলে গেছে পায়ের পাতার বাইরের দিকে। এই অংশকে বলে বল (ball)। এরপর সেখান থেকে ১৪টি ছোট্ট

হাড্ডির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে পায়ের অঙ্গুলির অস্থিকাঠামো। উল্লেখ্য পায়ের পাতা ও হাতের মধ্যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। উভয়ের মধ্যে হাড্ডির সংখ্যা প্রায় সমান- হাতের মধ্যে আছে ২৭টি আর পায়ের পাতায় ২৬টি। তবে পায়ের পাতার ও হাতের কর্মক্ষমতার মধ্যে বেশ তফাৎ বিদ্যমান। পায়ের পাতা দ্বারা খুব সীমিত কিছু কাজ সারা যায়- কিন্তু হাতের দ্বারা অসংখ্য দক্ষ কার্য সম্পাদন সম্ভব। এর কারণ হলো, হাতের মধ্যে নড়াচড়ার স্বাধীনতা পায়ের পাতার তুলনায় অনেকগুণ বেশী দেওয়া হয়েছে। এটা আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে, যার মধ্যে যেটুকু কর্মক্ষমতার প্রয়োজন সেটুকু তিনি যথাযথ দান করেছেন।

হাড্ডির জোড়া

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, মোট ২০৬ খানা হাড্ডির সমন্বয়ে মানব কঙ্কালসার গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ যাতে প্রয়োজনমাফিক নড়াচড়ার নিশ্চয়তা পায়, সে লক্ষ্যে বিশিষ্ট স্থানসমূহে জোড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট চার ধরনের জোড়া দ্বারা এই কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: ১. সেলাই; ২. কব্জা; ৩. বল ও সকেট; এবং ৪. গ্লাইড।



চার ধরনের হাড্ডির জোড়া (১. সেলাই; ২. কব্জা; ৩. বল ও সকেট; এবং ৪. গ্লাইড)

কিছু কিছু জোড়া আছে যেমন মাথার খুলি, যাতে খুব একটা নড়াচড়ার প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে সেলাইয়ের মতো জোড়া দেওয়া হয়েছে। এসব জোড়ার বৈশিষ্ট্য হলো শিশু জন্মের পর থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত হাড্ডিকে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা প্রদান। হাতের কনুই ও হাঁটুর জোড়া এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে চলাচলে বেশী স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এসব স্থানে তাই দরোজার কব্জার মতো জোড়া তৈরী করা হয়েছে। কোন কোন জয়েন্ট এভাবেও হওয়া দরকার যাতে করে একটা আরেকটার উপর দিয়ে গ্লাইড করতে পারে। এরূপ হাড্ডির জোড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পায়ের পাতায়। নড়াচড়ার স্বাধীনতা সর্বাপেক্ষা বেশী যেসব স্থানে প্রয়োজন সেখানে বল ও সকেট জয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। চক্রাকার নড়াচড়ার জন্য এসব জোড়া উপযুক্ত। মানবদেহের ঘাড় ও উরুর মধ্যে এরূপ জোড়া পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি এমন 'আলাকে' যা লেগে থাকে, তারপর সে আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, অতঃপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে অস্থিকে ঢেকে দিই গোশত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।" (সূরা মূ'মিনূন : ১৪)

উপরে আমরা দেহের মূল অস্থিকাঠামোর উপর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদির বর্ণনা দ্বারা মানবদেহের কঙ্কালসারের গুরুত্ব ও কৌশল বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কঙ্কালসার হলো দেহের ফাউন্ডেশন। এতে কোন গণ্ডগোল থাকলে পুরো দেহের মধ্যেই গণ্ডগোল বেঁধে যাবে। তাই মহান সৃষ্টিকর্তা খুব সুপরিকল্পিতভাবে এই কাঠামো নির্মাণ করেছেন। আর এই কাঠামোর

উপরই স্থাপন করেছেন নড়াচড়ার শক্তি যোগান দেওয়ার উপায়-অবলম্বন- অর্থাৎ আমাদের পেশীগুলো। সুতরাং এবার আমরা পেশীর উপর কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

২. পেশী

আমাদের দেহের মোট ওজনের ৩৫ শতাংশ পেশী থেকে এসেছে। সমগ্র দেহে ছড়িয়ে থাকা এই পেশীই আমাদেরকে শক্তি যোগান দেয় যার মাধ্যমে আমরা খাই-দাই ও কাজ করি। মোটকথা এই পেশীই আমাদেরকে চলমান রাখে। পেশী এমন সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক বানিয়েছেন যে, আমাদের মস্তিষ্কে তথা স্নায়ুতন্ত্রে জাগ্রত কোন ইচ্ছা যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন পেশী সে ইচ্ছাকে পূরণ করে। অর্থাৎ হাত-পা ইত্যাদি চলমান করার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপদান করতে যেয়ে পেশী প্রয়োজনে সংকোচ হয়।

মানবদেহে তিন ধরনের পেশী আছে। এগুলো হলো মসৃণ, কঙ্কালযুক্ত ও হৃদযন্ত্রের পেশী। আমাদের দেহের মসৃণ পেশীর কোষও মসৃণ। এসব পেশী আমাদের অজানা কিছু কাজে জড়িত আছে। এসব ক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় কার্য বলা যায়। এসব পেশী অভ্যন্তরীণ অনেক পিরিওডিক কাজে জড়িত থাকে। যেমন পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত মসৃণ পেশীর কাজ হলো খাদ্যনালী থেকে শুরু করে গলদ্ধকৃত সকল খাদ্যকে মলদ্বার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া আমাদের চামড়া, অভ্যন্তরীণ অরগ্যান, পুনর্জনন সিস্টেম, প্রধান রক্ত শিরা ইত্যাদির পেশী হলো মসৃণ।

কঙ্কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত পেশীতে আছে বিশেষ স্নায়ুকোষ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। এসব পেশী আংশিকভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ কারণে এগুলোকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত পেশী বলা যায়। অর্থাৎ আমরা যখন কোন কার্য সমাধান-কল্পে নিজেদেরকে নড়াচড়া করার ইচ্ছা পোষণ করি তখন মস্তিষ্ক থেকে স্নায়বিক সিগনাল সংশ্লিষ্ট পেশীতে আসে- ফলে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। চামড়ার নীচে হাড্ডির উপরে এসব পেশী পাওয়া যায়। মানুষকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বান্দা হিসাবে দেখতে চান অর্থাৎ তিনি

তাকে কথা, অন্তর ও দেহ দ্বারা ইবাদতকারী হিসাবে দেখার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তাই এসব কার্য পালনের জন্য এবং বেঁচে থাকার উপকরণ হিসাবে চিন্তাশীল, চলমান ও পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারোপযোগী একটি উন্নতমানের দেহযন্ত্র প্রদান করেছেন। কথা বলা ও নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদতে পেশী শক্তি একান্ত জরুরী। আর পেশীকে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই আমরা প্রভুর ইবাদত বন্দেগী করতে সক্ষম হই। পেশীকে তাই কিছুটা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন যাতে সে আনুগত্য প্রকাশের জন্য (অর্থাৎ নামাজসহ সকল ইবাদত করার ক্ষেত্রে) নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এখানে তাকে স্বাধীনতা প্রদান করে পরীক্ষা করা হলো উদ্দেশ্য। বেঁচে থাকার জন্য জরুরী পেশী শক্তি কিন্তু স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। এসব ব্যাপার বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ যদি ভাবে তাহলে তাকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তার নিকট উন্মোচন হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় প্রকার পেশী দ্বারা আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র হৃদয়কে তৈরী করা হয়েছে। শক্তিশালী এই পেশীর একটিমাত্র কাজ হলো শরীরের সর্বত্র রক্ত পাম্প করা। এসব সদা-ক্রিয়াশীল পেশীর কোষগুলো অক্সিজেনের জন্য অত্যন্ত পিপাসার্ত। প্রতিমুহূর্তে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত না থাকলে এসব পেশী মারা যায়। আর অক্সিজেনের অভাব হেতুই হার্ট এটাক সংঘটিত হয়। হৃদযন্ত্রের পেশীও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে। তবে তা অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম তথা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশীর মধ্যে এই সিস্টেম থেকে দেওয়া আছে অসংখ্য স্নায়ুকোষ। কিন্তু এই সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ সর্বক্ষেত্রে নয়- অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের পেশীর নিয়মিত পাম্প একশন বা স্পন্দনকে সময় সময় গতি কমানো বা বাড়ানো ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয় না। বাস্তবে কোন্ শক্তি আমাদের হৃদযন্ত্রের এই নিয়মিত স্পন্দন ঘটিয়ে থাকে তা আজো জানা যায় নি। অটোনোমিক সিস্টেম কিভাবে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন রেট বাড়ায় কমায় তা একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়বে। আপনি যদি খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করেন তখন দেহের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়ানোর প্রয়োজন দাঁড়ায়- অর্থাৎ হৃদযন্ত্রকে তড়িৎ বেগে চালিয়ে সমগ্র শরীরব্যাপী অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করা হয়। এখানে অটোনোমিক

নার্ভাস সিস্টেমই কাজ করে। আপনার হৃদয়ের হার্টবিট (হৃৎস্পন্দন) রেট বেড়ে যায়- আপনি হয়রান অনুভব করেন এবং দ্রুত শ্বাস-নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অতিরিক্ত অক্সিজেন ভেতরে নিয়ে যান। আবার কিছুক্ষণ পরে আপনার দেহের অক্সিজেন চাহিদা সাধারণ পর্যায়ে এসে গেলে হার্ট বিটও কমে এসে সাধারণ পর্যায়ে পৌঁছে। এক্ষেত্রেও স্নায়ুকোষের সিগনাল পেয়ে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়। সুবহানাল্লাহ! কী সুন্দর সিস্টেম! আমাদের হৃদযন্ত্র কেন এভাবে চলে তা কেউ আজো জানতে পারে নি- তবে আমরা বলি শুধু এটি কেন, পুরো দেহের যাবতীয় কার্যকলাপ যিনি নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা। সুতরাং যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নন।

৩. চামড়া

চামড়া হলো দেহের আবরণ। তবে চামড়ার অনেক ফাংশন বা কাজ আছে। এর মধ্যে একটি হলো দেহের সৌন্দর্য নিশ্চিতকরণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড়ো কাজ হলো আমাদেরকে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দান। কারণ, চামড়া থাকার ফলেই পারিপার্শ্বিকতায় ছড়িয়ে থাকা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক বস্তুর আক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পাই। এই চামড়া ক্ষতিকর রসায়নিক দ্রব্য ও ক্ষুদ্রকায় অদৃশ্য রোগ জীবাণু দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। একইভাবে ভেতরে জীবন-রক্ষাকারী পানীয় বস্তু যাতে বের হয়ে না যায় তারও নিশ্চয়তা দেয়। আরো যেসব জীবন-রক্ষামূলক কাজ চামড়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় তাদের মধ্যে ক'টি হলো সূর্যের ক্ষতিকর আলট্রাভাইলোট রশ্মি থেকে দেহকে মুক্ত রাখা; দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ; কিছু বর্জ্য দ্রব্যাদি বের হতে দেওয়া যেমন, ঘর্ম; এবং ছোঁয়া বা তক্বের ইন্দ্রিয় যন্ত্র হিসাবেও চামড়ার ভূমিকা সর্বাধিক।

আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা বড়ো দেহযন্ত্র হলো চামড়া। একজন পরিণত বয়স্ক পুরুষের চামড়ার ওজন ৪.৫ থেকে ৫ কেজি হয়ে থাকে। এর ক্ষেত্রফল ২ স্কোয়ার মিটার। বিভিন্ন স্থানে চামড়ার গাঢ়ত্বের মধ্যে

তারতম্য আছে। এর মাত্রা ১.৪ মিমি থেকে ৪.০ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেসব স্থান সর্বদা বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে ঘর্ষণে বিদ্যমান সেসব স্থানে চামড়ার গাঢ়ত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। জীবন চলার পথে আমরা প্রায়শঃই চামড়া ক্ষয় এমন অবস্থার শিকার হয়ে থাকি। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম সৃষ্টিকৌশলের ফলে চামড়া নিজেই নিজেকে মেরামত ও নতুনভাবে গড়তে পারে। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের চামড়ায় যেসব বস্তু গেড়ে থাকে তাদের মধ্যে চুল, নখ ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি এখানে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থি হলো ওসব কোষের সমষ্টি যা থেকে বিভিন্ন ধরনের উপাদান তৈরী হয় এবং এগুলো দেহের অন্যান্য অংশে কাজে লাগে।

আমাদের চামড়ায় ১৬ থেকে ৪০ লক্ষ পর্যন্ত ঘর্ম উৎপাদনকারী গ্রন্থি আছে। এদের মধ্যে যেসব স্থানে এগুলোর সংখ্যা বেশী তা হলো হাতের তালু ও পায়ের তলা। ঘর্ম সৃষ্টি হয় গ্রন্থির নিম্নস্থ কোষে। আর ঘর্ম মূলত পানি, লবণ ও অত্যল্প পরিপাকতান্ত্রিক বর্জ্য থেকে সৃষ্ট। চামড়ার ভাজে ঘর্ম পৌঁছে গেলে দেহের জন্য জরুরী অধিকাংশ লবণ আবার চামড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তবে চামড়ার বাইরে আসা ঘর্ম বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এই প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের দেহ গরমের সময় কিংবা অধিক ব্যায়ামের পর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। ঘর্ম গ্রন্থিসমূহ দৈনিক ১০ লিটার পর্যন্ত পানীয় তৈরী করতে সক্ষম।

আমাদের চামড়ায় শুধু ঘর্মগ্রন্থি আছে তা নয়- তৈলাক্ত দ্রব্য সৃষ্টিকারী আরেক ধরনের গ্রন্থি আছে। এগুলো মুখমণ্ডলে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থি সিরাম নামক তৈলাক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করে শুষ্ক চামড়াকে নরম রাখার উদ্দেশ্যে। অপর আরেক ধরনের গ্রন্থি আছে যার কাজ হলো কানের ভেতর মোম-জাতীয় দ্রব্য তৈরী করা। এই দ্রব্যটি ক্ষতিকর বস্তু কানের ভেতর দিয়ে যাতে না ঢুকতে পারে তা নিশ্চিত করে।

৪. শ্বাস-নিঃশ্বাস

আমাদের রক্তসঞ্চলন সিস্টেমে সর্বদা অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করতে যেয়ে কিছু দেহযন্ত্র অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। অক্সিজেন দেহের কোটি কোটি কোষ জীবিত থাকার জন্য জরুরী উপাদান। কোষের ক্রিয়া-কলাপ সঠিকভাবে সংঘটনের পূর্বশর্ত হলো পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন। আল্লাহ পাক বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন উপায়ে পর্যাপ্ত অক্সিজেন রাখেন। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি সবুজ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষাদি ফটোসিনথেসিস নামক রসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে অক্সিজেন তৈরী করে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এভাবে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত থাকে। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের শ্বাসক্রিয়া রক্তের মধ্যে অক্সিজেন যোগান দেওয়ার কাজ ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে, আর তাহলো কোষের বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস দেহ থেকে বের করে দেওয়া। এই গ্যাসটি আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং সরাসরি চেতনা ছাড়াই শ্বাসক্রিয়া দিবারাত্র সংঘটিত হচ্ছে। যদি কয়েক মিনিট মাত্র সময় শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেনের অভাবে খুব দ্রুত দেহের কোষগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং সমগ্র দেহের কার্যাদি তড়িৎ বন্ধ হয়ে পুরো দেহটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

শ্বাসক্রিয়ার মূল কাজ অক্সিজেন ভেতরে নেওয়া ও কার্বন ডাইওক্সাইড বের করা হলেও এটা আরো কিছু জরুরী কাজে নিয়োজিত থাকে যা আমাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেহের টিস্যুতে এই সিস্টেমই এসিড ব্যালান্স বজায় রাখে; এটা দেহকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে- কারণ বায়ুমণ্ডলে অনেক অদেখা রোগ জীবাণু আমরা শ্বাসের মাধ্যমে দেহের ভেতর নিয়ে থাকি; এই ক্রিয়া দ্বারাই আমরা কোন জিনিসের মধ্যস্থিত গন্ধ অনুভব করি; এবং শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে আমাদের কথা বলার ক্ষমতা।

দু'টি পর্যায়ে শ্বাসক্রিয়া ও রক্তসঞ্চলন সিস্টেম দেহের কোষে অক্সিজেন যোগান দেয়। প্রথম পর্যায়ের শুরু হয় শ্বাস নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এসময় আমরা বাইরের বাতাস ফুসফুসের মধ্যে নিয়ে যাই। এই বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তা ফুসফুস থেকে শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে হৃদযন্ত্রে চলে যায়। হৃদযন্ত্র তখন এই 'অক্সিজেন-সর্বস্ব' রক্তকে পাম্প করে দেহের সর্বত্র কোষের মধ্যে নিয়ে পৌঁছায়। এ পর্যন্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে কোষ পর্যন্ত অক্সিজেন গেলো এবং প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। অক্সিজেন পেয়ে কোষ একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে এনার্জি তৈরী করে- যাকে বলে কোষীয় শ্বাসক্রিয়া। তবে এটা করতে যেয়ে বর্জ্য বা বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে তৈরী করে কার্বন ডাইওক্সাইড। দ্বিতীয় শ্বাসক্রিয়ার পর্যায় শুরু হয় এই কার্বন ডাইওক্সাইডকে কোষ থেকে রক্তের মধ্যে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং কার্বন ডাইওক্সাইড-সর্বস্ব রক্ত হৃদযন্ত্রে আসার পর তা পাম্প করে ফুসফুসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ফুসফুসে আসার পর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমরা এই গ্যাসকে শেষ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেই। এরই মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

আগেই বলেছি আমাদের অজান্তেও শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে- যেমন ঘুমন্তাবস্থায়। কোন জিনিসটি এই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বাবস্থায় জ্যান্ত রাখার কৌশল হিসাবে মানবদেহে একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। ফুসফুসে বাতাস ঢুকা ও বের হওয়া এই সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা একটু পরই নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করবো। এখানে শুধু বলে রাখা প্রয়োজন কিভাবে শ্বাসক্রিয়াকে এই সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দিবারাত্র এই নিয়ম রক্ষা করতে হবে। সুতরাং আমরা যাতে শ্বাস-নিশ্বাস ক্রিয়া থেকে মুক্ত না থাকি সে ব্যবস্থা করা হয়েছে অবচেতনভাবে তা পরিচালনা করে।

সুতরাং আল্লাহ পাক কোন্ কৌশলে এই ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন? এটার শুরু আমাদের মস্তিষ্কের একটি অংশে যাকে শ্বাসক্রিয়ার সেন্টার বলে। এটা মগজের কাণ্ডে অবস্থিত। সেখানে একদল স্নায়ুকোষ এ কাজে নিয়োজিত আছে। ফুসফুসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডায়াফ্রাম ও পাঁজরের পেশীতে ওসব স্নায়ুকোষ একই সঙ্গে কিছু স্নায়বিক সিগনাল প্রেরণ করে। এই উভয় পেশী শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডায়াফ্রাম হলো বড়ো এক টুকরো গম্বুজ

সদৃশ পেশী যার অবস্থান ফুসফুসের একটু নীচে। স্নায়বিক সিগনাল দ্বারা যখন ডায়াফ্রাম সজাগ হয়ে ওঠে তখন এটা সমতল আকার ধারণ করে। নীচের দিকে ডায়াফ্রামের এই চলন হেতু যে গহ্বরের মধ্যে ফুসফুস আছে তার ভলিউম বৃদ্ধি পায়। এই গহ্বরকে থোরাটিক কাভিটি বলে। এদিকে যখন পাঁজরের পেশীতেও মগজ থেকে স্নায়বিক সিগনাল আসে তখন তাও সংকোচ হয়- ফলে পুরো পাঁজর পিঞ্জর উপরের দিকে টেনে তুলে ফেলে। এই চলন থেকেও থোরাটিক কাভিটির ভলিউম বৃদ্ধি পায়। কাভিটি এভাবে বেড়ে যাওয়ায় বাইর থেকে বাতাস দ্রুত ফুসফুসে যেয়ে পৌঁছে। নার্ভাস সিস্টেমের এই ক্রিয়াটি খুব ক্ষণস্থায়ী হয়- এর ফলে ডায়াফ্রাম ও পাঁজরের পেশী পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে- এতে বাতাস আবার ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসে। সাধারণত শ্বাসক্রিয়ার সেন্টার থেকে প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ২০টি পর্যন্ত সিগনাল আসে। ফলে আমরা ১২ থেকে ২০ বার পর্যন্ত শ্বাস-নিঃশ্বাস করে থাকি। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুরা মিনিটে ৩০ থেকে ৫০ বার শ্বাস-নিঃশ্বাস করে থাকে। এর কারণ হলো, তাদের শরীরের কোষগুলো খুব দ্রুত বিভক্ত হতে থাকে শিশুকে বেড়ে তোলার লক্ষ্যে। সুতরাং কোষের মধ্যে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে।

আমাদের শ্বাসক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শ্বাসক্রিয়া সেন্টারের নিয়ন্ত্রণে নয়। চেতনশীল উপায়ে আমরা শ্বাসক্রিয়াকে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেমন কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখা। এছাড়া কেউ যদি শিশ দেয় বা গান গায় তাহলে শ্বাসক্রিয়ার মধ্যে তারতম্য ঘটে। চেতনা দ্বারা এভাবে শ্বাসক্রিয়াকে অন্তত সীমিত নিয়ন্ত্রণের পথ খোলা রাখার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এক বিরাট কৌশল কাজ করে। মনে করুন আপনি পানির ভেতর ডুব দিয়েছেন। এখন যদি আপনি শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করতে না পারতেন তাহলে উপায় কি হতো? বেঁচে থাকার জন্য জরুরী অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসক্রিয়া বন্ধ রাখা তাই আমাদের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে তা কী অপূর্ব কৌশলে সম্পাদিত হয়, একবার ভেবে দেখুন।

শ্বাসক্রিয়ার সেন্টার থেকে সর্বদাই নিয়মিত শ্বাস-নিঃশ্বাস নেওয়ার সিগনাল আসতে থাকে। আমাদের মগজের আরেক কেন্দ্রে চিন্তাশক্তির সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে একটি সিগনাল আসে যখন আমরা শ্বাস বন্ধ করতে

ইচ্ছা করি। এই সিগনাল এসে ডায়াফ্রাম ও পাঁজরের পেশীতে পৌঁছে শ্বাসক্রিয়ার সেন্টারের সিগনালকে 'অভাররাইড' বা প্রতিস্থাপন করে দেয়। ফলে আমরা শ্বাসক্রিয়া বন্ধ রাখতে সক্ষম হই। কিন্তু বেশীক্ষণ বন্ধ রাখলে ক্ষতি হবে তাই একটি আলাদা কৌশল রাখা হয়েছে যাতে স্বেচ্ছায় শ্বাসক্রিয়া অতিরিক্ত সময় বন্ধ রাখতে সক্ষম না হই। কারণ, দেহের ভেতর কোষের কার্যকলাপ থেকে শীঘ্রই খুব বেশী পরিমাণ কার্বন ডাইওক্সাইড জমা হয়ে পড়বে। এর ফলে রক্তের মধ্যে এসিডের মাত্রা বেড়ে মারাত্মক পর্যায়ে চলে যাবে। অতিরিক্ত এসিড কোষের এনজাইম নামক অনুঘটক (বা কাটালিস্ট) মলিকিউলগুলোর কার্যে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় বেশীক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখা চলবে না। তাহলে কোন শক্তি আমাদেরকে বেশীক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখতে আবার বাধাদান করে? একটি সুপরিকল্পিত কৌশলে আমাদেরকে স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। রক্তের মধ্যে যাতে অতিরিক্ত এসিড না জমে সেটা নিশ্চিত রাখার জন্য কিমোরিসেপটর নামক একদল কোষ সর্বদা ডিউটিতে আছে। ঘাড়ের মধ্যে মস্তিষ্কের কাণ্ডে ও রক্ত শিরার মধ্যে এসব রিসেপটর অবস্থান করে। এদের কাজই হলো রক্তের মধ্যে কি পরিমাণ এসিড আছে তা মনিটর করা। যেই মুহূর্তে এসিডের মাত্রা সীমা অতিক্রম করবে সাথে সাথে এসব কোষ মস্তিষ্কের শ্বাসক্রিয়ার সেন্টারে একটি সিগনাল প্রেরণ করবে। এই রেড সিগনাল পেয়ে ইচ্ছাকৃত যে সিগলান দ্বারা আমরা স্বেচ্ছায় শ্বাস বন্ধ করে রেখেছিলাম তাকে 'অভাররাইড' করার একটি শক্তিশালী সিগনাল শ্বাসক্রিয়ার সেন্টার থেকে প্রেরিত হবে। ফলে আমরা বাধ্য হয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার সাধারণ শ্বাসক্রিয়া শুরু করি।

শ্বাস-নিঃশ্বাস সঠিক থাকা এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যদি জোর করে খুব বেশী বাতাস ফুসফুসের মধ্যে নিতে চাই তবে এক পর্যায়ে এসে আমরা ব্যর্থ হতে বাধ্য হই। এই ব্যর্থতার পেছনেও একটি অপূর্ব কৌশল কাজ করে। মনে করুন আপনি ইচ্ছা করলেন যতো বেশী সম্ভব বাতাস ভেতরে ঢুকাবেন। বাতাস ঢুকালে স্বভাবতই আপনার ফুসফুসের ভলিউম বাড়তে থাকবে। তবে সেখানে কিছু বিশেষ কোষ আছে যাদের কাজ হলো ভলিউম কি পরিমাণ আছে তা মনিটর করা। যদি তা এমন পর্যায়ে বেড়ে

যায় যে, ফুসফুস ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে ওসব রিসেপটর সাথে সাথে একটি সিগনাল শ্বাসক্রিয়ার সেন্টারে প্রেরণ করবে। এই ওয়ার্নিং সিগনাল পেয়ে শ্বাসক্রিয়ার সেন্টার থেকে একটি সিগনাল এসে শ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় পেশী শক্তিকে বন্ধ করে দেয়। ফলে আর অতিরিক্ত বাতাস ঢুকানো সম্ভব হয় না।

সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব কৌশল! এতে বুঝা গেল ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ংক্রিয় নার্ভ সিগলানকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব- তবে এতো বেশী নয় যার ফলে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি। প্রতিটি নিঃশ্বাসকে সুফিরা মৃত্যুর সিগনাল বলে থাকেন। কারণ এসব নিঃশ্বাসের একটি অবশ্যই শেষ নিঃশ্বাস হবে। শ্বাসক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। সুতরাং একে সঠিকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার এতো কৌশল, এতো উপায় অবলম্বন! এটাকে যদি বেশী কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হতো তাহলে আমাদের জীবন চলার ক্ষেত্রে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হতো। আর অপরদিকে এই ক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হলেও অজান্তে আমরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়তাম- এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতো। এসব ব্যাপার বিবেচনা করে মহান রাব্বুল আলামীন শ্বাসক্রিয়াকে উভয়কুল রক্ষার্থে বিভিন্ন কলা-কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার সীমা নেই।

৫. রক্ত চলাচল

রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার গুরুত্ব কী তা আশারাখি আমাদের কারো অজানা নেই। দেহের মধ্যে রক্তের সঠিক চলাচলের ফলেই পুরো দেহটি বেঁচে থাকে। যেসব কোটি কোটি ক্ষুদ্রাংশের সমন্বয়ে আমাদের দেহটি গঠিত তার নাম কোষ। আর প্রত্যেক কোষকে তার নির্দিষ্ট কার্যাদি সঠিকভাবে পালন করতে যেয়ে নিজেকে বেঁচে থাকতে হবে ও বাইর থেকে এনার্জি সাপ্লাইয়ের উপর নির্ভর করতে হবে। বাইরের যে এনার্জি কোষের জন্য জরুরী তা হলো অক্সিজেন গ্যাস। রক্তের কাজ হলো এই গ্যাস বহন করে কোষে কোষে পৌঁছে দেওয়া এবং একই সাথে কোষ থেকে বেরিয়ে আসা

বিষাক্ত কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস ক্যারী করে দেহ থেকে বের করার জন্য ফুসফুসে নিয়ে পৌঁছানো। সুতরাং আমাদের রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার সঙ্গে একাধিক দেহযন্ত্র জড়িত। এগুলো হলো: ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, রক্ত ও শিরা-উপশিরা।

রক্ত সঞ্চলন সিস্টেমের মূল কাজ হলো অক্সিজেন সাপ্লাই ও কার্বন ডাইওক্সাইড সরানো। তবে এই সিস্টেম আরোও এক দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও যন্ত্রের পুষ্টিকর বস্তু বহন; দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ; ক্ষতিকর বাইরের জীবাণু বা বস্তু যদি দেহের ভেতর ঢুকে তাহলে ওসব বস্তু ধ্বংসের জন্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম দ্বারা নির্দেশিত এ্যন্টিবডি ও সাদা রক্তকোষ আক্রমণ স্থলে নিয়ে যাওয়া; কোন কারণে রক্তক্ষরণ হলে সেখানে জমাট বাধানোর কোষ নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়।

সমগ্র দেহব্যাপী তিন ধরনের রগ আছে। এগুলোকে বলে ধমনী, শিরা ও উপশিরা। ধমনীর কাজ হলো হৃদযন্ত্র থেকে রক্ত নিয়ে যাওয়া ও কোষে কোষে পৌঁছানো। শিরার কাজ হলো দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃদযন্ত্রে নিয়ে আসা। এই উভয়বিধ রগের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছোট্ট ছোট্ট উপশিরাগুলোই আসলে কোষের সঙ্গে যুক্ত। এদের দেওয়াল পেরিয়ে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্যাদি যথাক্রমে কোষ ও দেহযন্ত্রে যেয়ে পৌঁছে। আর এদের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে কোষ ও অন্যান্য যন্ত্র থেকে বর্জ্য বস্তু রক্তের মধ্যে এসে দেহের বাইরে চলে যায়।

আমাদের দেহের ভেতর রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার মূল যন্ত্রটি যে হৃদযন্ত্র তা সবার জানা। হৃদযন্ত্রকে অনেকেই জীবন্ত থাকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলেন। আসলেও তা-ই। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা বিট আছে কি না সেটা পরীক্ষা করে আমরা জেনে নিই লোকটি জীবিত না মৃত। হৃদযন্ত্রের ধ্বনি থেকেও বুঝা যায় কারো প্রাণ আছে কি না। মাত্র কয়েক মিনিট এই পাম্পটি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে আর বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে ষাট সত্তুর বৎসর কিংবা হায়াত যতোদিন আছে ততোদিন পর্যন্ত অবিরাম এই যন্ত্রটি কাজ করে যায়। মানুষের অবস্থা

যেটাই থাকুন না কেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মারা যায় না। সুতরাং এই অপূর্ব পাম্পটি ঠিক কিভাবে কাজ করে? আমরা ‘আল্লাহর কুদরত: বিভিন্ন দেহযন্ত্র’ অধ্যায়ে হৃদযন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো। এ প্রসঙ্গে রক্ত চলাচল ক্রিয়ার প্রধান উপায় হিসাবে হৃদযন্ত্রের পাম্পিং একশন সম্পর্কে কিছুটা তথ্য তুলে ধরছি মাত্র।

আমাদের হৃদয়টিতে চারটি আলাদা কোঠা বা চেম্বার আছে। এগুলোকে আমরা ডানের প্রথম চেম্বার ও ডানের দ্বিতীয় চেম্বার এবং বামের প্রথম চেম্বার ও বামের দ্বিতীয় চেম্বার বলে সম্বোধন করতে পারি। এগুলোর অবশ্যই বৈজ্ঞানিক নাম আছে- কিন্তু আমি ওসব কঠিন নাম ব্যবহার করবো না। আমাদের উদ্দেশ্য এই চারটি চেম্বার কিভাবে কাজ করে তা বুঝা ও আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের স্বরূপ অনুধাবন করা। এই চারটি চেম্বারের দেওয়াল কিছু বিশেষ পেশী দ্বারা সৃষ্ট। এসব পেশী অনবরত সংকোচ ও শিথিল হতে থাকে- ফলে পাম্পিং ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

হৃদযন্ত্রের এই পাম্পিং ক্রিয়া দু’টি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রত্যেক হার্ট-বিট বা স্পন্দনের মধ্যে এই উভয় পর্যায় বিদ্যমান। প্রথম পর্যায়কে বলে ডায়াস্টলি। এসময় হৃদযন্ত্র রেস্ট বা শিথিল অবস্থায় থাকে। আর দ্বিতীয় পর্যায়কে বলে সিস্টলি। এসময় হৃদযন্ত্র সংকোচ হয়। এই সংকোচনের সময়ই দু’টি ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটিত হয়: অক্সিজেন-সর্বস্ব রক্ত পাম্প করে দেহের সর্বত্র পাঠানো ও অক্সিজেনমুক্ত কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড-সর্বস্ব রক্ত পাম্প করে ফুসফুসে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যেকটি হার্ট-বিটের সময় ৬০ থেকে ৯০ মিলিলিটার রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে পাম্প করে বের করা হয়। আর এই পাম্পিং যদি কোন কারণবশত বন্ধ হয়ে যায় তাহলো সাধারণত চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

রক্ত অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য পরিপাকতান্ত্রিক বর্জ্য বহন করে একথা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। ঠিক কিভাবে এসব কাজ সংঘটিত হয়? বিশেষকরে রক্ত বলতে কী বুঝায়? এসব প্রশ্নের জবাব এখন আমরা খুঁজে দেখবো। রক্তে থাকে তিন ধরনের কোষ। এগুলো হলো অক্সিজেন বহনকারী লাল রক্তকোষ, রোগ-বিরোধী সাদা রক্তকোষ

এবং রক্ত জমাট সৃষ্টিকারী কোষ যাদেরকে বলে প্লেটলেট। এসব কোষ প্লাজমা নামক একটি তরল পদার্থে ভাসমান থাকে। সুতরাং রক্ত বলতে ঐ তিন ধরনের কোষ ও প্লাজমাকে বুঝায়। প্লাজমা মূলত পানি, লবণ, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, হর্মোন, অন্যান্য গলিত গ্যাস এবং মেদী বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত তরল পদার্থ।

আমরা এটাও ইতোমধ্যে জেনেছি যে, তিন ধরনের রগের মাধ্যমে রক্ত চলাচল করে। এবার কিভাবে এসব রগের মাধ্যমে রক্ত সঠিক স্থানে যায় তা একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমতঃ ধমনীর (artery) কাজ হলো হৃদযন্ত্র থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে বহন করে নেওয়া এবং উপশিরার (capilary) মাধ্যমে কোষে কোষে পৌঁছানো। দ্বিতীয়তঃ শিরার (াবরহ) কাজ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্যযুক্ত রক্তকে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হার্টে নিয়ে আসা যাতে তা ফুসফুসের মধ্যে পৌঁছিয়ে বর্জ্য দ্রব্যাদি ফেলে পুনরায় অক্সিজেনযুক্ত করা যায়। লক্ষ্য করুন, দু'টি ভিন্নমুখী রক্ত সঞ্চলনের জন্য দু'টি আলাদা রগ তৈরী করা হয়েছে। হৃদযন্ত্রের পাম্পিং একশনের সময় উভয় ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটে। রক্ত যাতে বেশ বড়ো ধমনি ও শিরা এবং অতি ক্ষুদ্র উপশিরার মধ্য দিয়ে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে সেটার নিশ্চয়তা দানের লক্ষ্যে এসব রগের অভ্যন্তরীণ দেওয়ালে কিছু বিশেষ পিচ্ছিল কোষ আছে। এছাড়া রক্তের মাত্রা কমবেশী হয়ে চলমান রাখার একটি উপায় করে রাখা হয়েছে। যেসব পেশী দ্বারা রগগুলো সৃষ্ট তাদের একটি গুণ হলো প্রয়োজনে আয়তনে ছোটবড় হওয়া। সুতরাং আমরা যখন ব্যায়াম করি কিংবা কোনভাবে হয়রান হয়ে পড়ি তখন দেহের মধ্যে অতিরিক্ত রক্ত পাম্পের প্রয়োজন দাঁড়ায়। এসময় ধমনী, শিরা ও উপশিরার ব্যাস যদি বাড়ার ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সমস্যা হতো।

আমরা সবাই ব্লাডপ্রেসার কি জিনিস জানি। অনেকের এ ব্যাপারে তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে কারণ তারা হয়তো উচ্চ রক্তচাপ কিংবা নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন। রক্তচাপ কি এবং কেন তা ক্ষতিকর পর্যায়ে যায় তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

রক্তচাপ হলো চলমান রক্তের চাপ। এই চাপ সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র ধমনীর দেওয়ালে। আর ধমনী হলো হৃদযন্ত্র থেকে যেসব রগের মাধ্যমে রক্ত বেরিয়ে আসে- অর্থাৎ যেসব রগ কোষে কোষে রক্ত পৌঁছায় ওগুলোকে বলে ধমনী। রক্তচাপ থেকে রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া কতটুকু সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন তা বুঝা যায়। রক্তের চাপে তারতম্য ঘটানোর কিছু কারণ আছে: ধমনীর ব্যাস কম বা বেশী হওয়া, হৃদযন্ত্রের মধ্যে কোন রোগ থাকা যার কারণে এর পাম্পিং ক্রিয়ায় বেশকম হওয়া ইত্যাদি। একজন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির রক্তচাপ একটি নির্দিষ্ট গড় ব্যাপ্তির মধ্যে থাকে।

আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ তাঁর অধিকাংশ বান্দার রক্তের চাপ মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেয়ে তিনি বিভিন্ন উপায়-উপকরণ দেহের মধ্যেই মওজুদ রেখেছেন। যেমন, আমাদের অতি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র জীবনচলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় তারতম্য ও রক্ত চলাচলে প্রয়োজনে বেশকম ঘটিয়েও, ধমনীর ব্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখে, যাতে রক্তচাপে খুব একটা বেশী তারতম্য না ঘটে। এছাড়া রক্তের যে কোষ দ্বারা অক্সিজেন ধমনীর মধ্যদিয়ে কোষে কোষে যেয়ে পৌঁছে সেই ‘হিমোগ্লবিন’ নামক কোষও রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। হিমোগ্লবিন নাইট্রিক অক্সাইড নামক গ্যাস বহন করে। এই গ্যাস রক্ত চলাচলের রগের দেওয়ালকে শিথিল করে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ধমনীর মধ্যে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার একাধিক কৌশল রাখা হয়েছে। এরপরও আমাদের নিজেদের লাইফ-স্টাইলের ফলে রক্তচাপে তারতম্য ঘটে থাকে।

দু’টি মাপ দ্বারা রক্তচাপ নির্ণিত হয়। ধমনীর মধ্যে যখন রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে পাম্প করে বের করা হয় ঠিক এ সময়কার রক্তচাপকে বলে সিস্টলিক প্রেসার। এসময় হৃদযন্ত্র সংকোচ অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় মাপকে বলে ডায়াস্টলিক প্রেসার। এসময় হৃদযন্ত্র শিথিল অবস্থায় থাকে এবং এর ভেতর রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়। সাধারণত ১২০/৮০ মিমি এইচজি (পারদ) হলো স্বাভাবিক রক্তচাপ। প্রথম সংখ্যাটি হলো সিস্টলিক ও দ্বিতীয়টি ডায়াস্টলিক রক্তচাপের মাপ।

৬. পরিপাক

মানুষকে বেঁচে থাকতে যেয়ে খাদ্য খেতে হয়। আমরা অনেক ধরনের খাদ্য ভক্ষণ করে থাকি। খাদ্য হলো দেহের এনার্জি চাহিদা পূরণের মূল সূত্র। হ্যাঁ, বাতাসে থাকা ফ্রি অক্সিজেন শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে নিয়ে কোষের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক রেখেছেন- যার বর্ণনা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি। কিন্তু দেহের জন্য শুধুমাত্র অক্সিজেন যথেষ্ট নয়। কোষ ও বিভিন্ন অরগ্যানের এনার্জি চাহিদা মেটাতে খাদ্যের মধ্যস্থ বিভিন্ন পুষ্টিকর দ্রব্যাদির প্রয়োজন। পরিপাক তন্ত্রের কাজ হলো খাদ্যের মোটা মোটা মলিকিউলগুলোকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র করে দেওয়া যাতে তা সহজেই রক্তের মধ্যে মিশ্রণ করা যায়। আল্লাহ পাক এই কাজের জন্য একাধিক দেহযন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। সবগুলো একত্রে মিলে খাদ্য থেকে পুষ্টিকর দ্রব্যাদি বের করে দেহের চাহিদা মেটানো এবং বর্জ্য বাইরে ফেলারও উপায় রাখা হয়েছে। রক্তের মাধ্যমে এসব পুষ্টিকর মলিকিউল কোষে কোষে পৌঁছে। কোষ এগুলো কাজে লাগায় নিজেদের বৃদ্ধি, মেরামত ও এনার্জির জন্য।

দু'টি পর্যায়ে পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর প্রথমটি হলো যান্ত্রিক সদৃশ ও দ্বিতীয়টি রসায়নিক। যান্ত্রিক পর্যায়ে দন্ত ও অন্যান্য কাঠামো দ্বারা খাদ্যকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। অর্থাৎ বড় বড় টুকরোকে ছোট্ট ছোট্ট টুকরোতে রূপান্তর করা হয় যাতে রসায়নিক ক্রিয়ায় এগুলো ভেঙ্গে আরও ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা সম্ভব হয়। রসায়নিক ক্রিয়ার সময় এনজাইম পরিপাক রসায়ন খাদ্যকে ভেঙ্গে একক মলিকিউলে পরিণত করে যাতে তা রক্তের মধ্যদিয়ে দেহের সর্বত্র পৌঁছে যেতে পারে। এসব এনজাইমও দেহের মধ্যে সৃষ্ট কিছু বিশেষ যন্ত্রাদি দ্বারা উৎপাদন ও রিলিজ হয়। এসব যন্ত্রাদিকে বলে গ্রন্থি বা গ্লান্ড।

খাদ্যকে মুখের ভেতর প্রবেশ থেকে শুরু করে মলদ্বার দিয়ে বর্জ্যাংশ বের হওয়া পর্যন্ত একটি সুচিন্তিত পরিপাক পথে নিয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং খাদ্য পথের প্রবেশপথ আমাদের মুখবিবর ও প্রস্থানপথ মলদ্বার। প্রবেশ পথে তা সুস্বাদু মজাদার দ্রব্য আর প্রস্থানপথে যেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য!

আল্লাহর কী অপরিসীম মেহেরবানী! খাদ্যের মধ্যে বর্জ্যের মাত্রা পুষ্টিকর উপযোগী বস্তু থেকে অনেক বেশী। তাই এসব বর্জ্য বের হয়ে যাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। আসলে পুরো দেহের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ তথা ফাংশন সত্যিই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার- যার সবই মহান আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল ও দয়ার ফসল। মানুষের মধ্যে আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে কিছুদিন জীবিত রাখার জন্য সব আয়োজন। সুবহানাল্লাহ! এসব ব্যাপার জানা ও বুঝার পরও কী মানুষ তাঁর অবাধ্য হতে পারে? তাঁর ইবাদত বন্দেগী থেকে গাফিল থাকতে পারে?

পরিপাক রাস্তার পেশী খাদ্যকে নিয়ে চলে। পরিপাক তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেহ যন্ত্রাদির মধ্যে মুখবিবর, গলনালী, পাকস্থলী, লিভার, বড় ও ছোট্ট আঁত ইত্যাদি এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব যন্ত্রের কোন কোনটি একাধিক কাজে জড়িত থাকে। যেমন মুখবিবর দ্বারা খাদ্য চিবুনিও গলদ্ধকরণ, কথা বলা ও শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হয়। দেহের অভ্যন্তরস্থ সর্বাধিক বড় যন্ত্র লিভারের মোট ফাংশন ৫ শতেকেরও অধিক বলা হয়ে থাকে। পরিপাক তন্ত্রের সঙ্গে লিভার জড়িত এ কারণে যে, এটা বাইল নামক (পিত্তরস) একটি পানীয় তৈরী করে। এই পানীয় যকৃতের নিকটবর্তী পিত্তাশয়ে জমা হয়। পরিপাকের সময় পিত্তরস ছোট্ট আঁতে যেয়ে পৌঁছে। এখানে এসে এই বস্তুটি খাদ্যের মেদকে ভেঙ্গে দেয় যাতেকরে তা দেহের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠে। ছোট্ট আঁত থেকে জৈবিক পদার্থ সম্মৃদ্ধ রক্ত যকৃতে যায় এবং সেখানে তা আরো প্রসেস শেষে মওজুদ করা হয়। এছাড়া অক্সিজেনমুক্ত রক্ত যকৃৎ থেকে বের হয়ে হৃদযন্ত্রে ফিরে আসে।

পাকস্থলী দ্বারা আংশিক পরিপাক শেষে খাদ্য ছোট্ট আঁতে এসে পৌঁছে। এই আঁতটি দৈর্ঘ্যে ৬ মিটার। পেটের মাঝখানে এর অবস্থান। এই আঁতের ভেতরই অধিকাংশ পরিপাক কার্য সম্পাদিত হয়। এখানে খাদ্য ক্রমান্বয়ে পরিপাক হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আঁতের দেয়ালের ভেতরে প্রোথিত আছে কোটি কোটি অঙ্গুলি সদৃশ বস্তু যাদের নাম ভিলি। এদের কাজ হলো পানীয় বস্তুতে পরিণত খাদ্যদ্রব্য থেকে উপযোগী মলিকিউল সংগ্রহ করা। প্রতিটি ভিলি কোষের নীচে ক্যাপিলারী বা উপশিরা বিদ্যমান। ভিলি থেকে পাক করা খাদ্যের উপাদান রক্তের

মধ্যে এসব উপশিরার মাধ্যমে যেতে থাকে। এভাবে ছোট্ট আঁত থেকে খাদ্যের উপকারী বস্তু বের করে নেওয়া হয়। কী অপূর্ব কৌশল! তবে এখানেই শেষ নয়। এই খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বর্জ্যও আছে যা আমাদের দেহের জন্য উপযোগী নয়। সুতরাং ছোট্ট আঁতের পেশী খাদ্যকে ধীরে ধীরে টিপিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যেয়ে বড় আঁতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

ছোট্ট আঁতের চতুর্দিকে বড় আঁতের অবস্থান। খাদ্যদ্রব্যের উপকারী বস্তু দেহের মধ্যে চলে যাওয়ার পর তা এখানে এসে পৌঁছে। এসময় খাদ্যবস্তু পানীয় অবস্থায় পরিণত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা হলে এসব বর্জ্য সোজা বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন কিন্তু খাদ্যের মধ্যে কিছু উপকারী বস্তু তখনও বাকী থাকায় এসব বের করে নেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। এই কাজটি বেশ দীর্ঘ বড়ো আঁত করে থাকে। বর্জ্য থেকে পানি ও মিনারেল দ্রব্যাদি বড়ো আঁতের দেওয়াল চুষে নেয়। ফলে বর্জ্য এখন সত্যিকার অর্থে মলে পরিণত হয় যা অনেকটা শক্ত। আঁতে আছে কোটি কোটি ক্ষুদ্রকায় জীবাণু। এদের কাজ হলো মল ভক্ষণ করা- ফলে মলের মাত্রাও কমে আসে। আঁতের পেশী ধীরে ধীরে সংকোচন হয়ে মলকে টিপিয়ে মলদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং তা বেরিয়ে আসে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, বৃহদন্ত্রের (অর্থাৎ বড় আঁতের) প্রবেশ দ্বারের নিকট একটি উপাঙ্গ (যাকে এ্যাপেন্ডিক্স বলে) আছে। বিজ্ঞানীরা আজো এটির কোন জানা ফাংশন বা কাজ আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে আমরা মনে করি আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই কোন জিনিস বিনা কারণে সৃষ্টি করেন নি। এ্যাপেন্ডিক্সেরও কোন এক বা একাধিক ফাংশন আছে যা আজকের বিজ্ঞান ধরতে অপারগ হলেও ভবিষ্যতে হয়তো একদিন জানা যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা মানবজাতির দেহের উপর অনেক কিছু আমরা ইতোমধ্যে জেনে নিলাম। দেহতত্ত্বের উপর আমাদের এই অপূর্ব অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণের কিন্তু শেষ হয় নি। অত্যন্ত জটিলভাবে সৃষ্ট আমাদের দেহের আরো অনেক ব্যাপার এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। সুতরাং এখন মোট ১১টি তন্ত্রের সপ্তমটি নিয়ে এবার আলোচনায় মনোযোগ দিচ্ছি। এই তন্ত্রটি হলো মূত্রতন্ত্র।

৭. মূত্রতন্ত্র

দেহকে সতেজ, প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষম রাখতে যেয়ে আল্লাহ্ পাক এর মধ্যস্থ সকল কোষে কোষে বিভিন্ন উপায়ে জৈবিক দ্রব্যাদি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। কোষের ক্রিয়াসহ যাবতীয় দেহক্রিয়া থেকে সবকিছুই দেহের জন্য উপকারী বস্তু তৈরী ও ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু নয়। সকল ক্রিয়ার মধ্যে থাকে কিছু বাই-প্রোডাক্ট যা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কাজের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বর্জ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যা দেহের ভেতর থেকে কৌশলে বের করে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় তা দেহের ক্ষতিসাধন করবে।

মূত্রতন্ত্র হলো একাধিক দেহযন্ত্রের ক্রিয়া যার মাধ্যমে মূত্র দেহের ভেতর থেকে বাইরে ফেলা হয়। মূত্র মূলত একটি হলুদ আলোকবেদ্য পানীয়। এতে আছে অকেজো বর্জ্য- যার অধিকাংশই পানি, লবণ এবং নাইট্রোজেন পদার্থ। মূত্রতন্ত্রের আসল যন্ত্রের নাম হলো বৃক্ক বা কিডনি। আমাদের দেহে দু'টি কিডনি আছে। এই কিডনি জোড়া সর্বদা রক্তকে ছেঁকে মূত্র তৈরী করে যাচ্ছে। ইউরিটার নামক দু'টি দীর্ঘ পাইপের মাধ্যমে মূত্র কিডনি থেকে বের হয়ে মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। পরিণত বয়সের যে কোন ব্যক্তির পেশী-সর্বস্ব এই মূত্রথলিতে অর্ধ লিটার পর্যন্ত মূত্র জমা থাকতে পারে। তাই আমরা কিডনিকে উন্নতমানের রক্ত ছাঁকা যন্ত্র হিসাবেও আখ্যায়িত করতে পারি। প্রত্যেক কিডনির মধ্যে আছে দশ লক্ষাধিক অতি ক্ষুদ্র ফিলটারিং বস্তু যাদের নাম হলো নেফরন। এই নেফরন ছাঁকার কাজ সারার সময় মূত্র তৈরী করে।

নেফরনের সৃষ্ট মূত্রের সবকিছু কিন্তু বর্জ্য নয়- বাস্তবে অধিকাংশ বস্তু দেহের জন্য উপকারী। সুতরাং একটি 'রি-সাইকেল' সিস্টেমের প্রয়োজন। এই পুনঃব্যবহারের উপায় কিডনি ও ব্লাডারের মধ্যে সংযুক্তকারী দীর্ঘ পাইপের মধ্যে বিদ্যমান। কিডনি থেকে বেরিয়ে আসা মূত্রে যেসব বস্তু থাকে তাদের মধ্যে ইউরিয়া - প্রোটিন ভেঙ্গে পড়ার ফলে যে নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ থাকে; লবণ; গ্লুকোজ; আমিনো এসিড - প্রোটিনের

বিল্ডিং ব্লক; লিভার থেকে আসা হলুদ পিত্তরসযুক্ত পদার্থ এবং রক্তের অন্যান্য বস্তু।

রি-সাইকেল শেষে মূত্রের অবশিষ্টাংশ বর্জ্য হিসাবে প্রবেশ করে মূত্রথলিতে। ব্লাডার বা মূত্রথলি অর্ধ লিটার পর্যন্ত মূত্র জমা করে রাখতে পারে। তবে ঠিক কোন সময় প্রস্রাব করতে হবে? এ ব্যাপারেও ডিজাইনে কোন ভুল নেই- ব্লাডার যখন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি হবে তখনই এর দেওয়ালে স্থাপিত কিছু টেনশন-কাতর কোষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের মধ্যে প্রস্রাবের জোর সৃষ্টি হয়।

আমাদের কিডনিদ্বয় দৈনিক ১.৫ লিটার মূত্র তৈরী করতে পারে। তবে সাধারণত দেহ থেকে ১.৫ লিটার মূত্র দৈনিক বের করে ফেলতে হয়। খুব বেশী কিংবা অত্যল্প মূত্র তৈরী হলে বুঝতে হবে কোন সমস্যা আছে। যা হোক, কোমরের সমপরিমাণ উচ্চে মেরুদণ্ডের উভয় দিকে মেদী টিস্যুর মধ্যে আমাদের কিডনিদ্বয়ের অবস্থান। হাতের মুটোর সমান প্রতিটি কিডনি দেখতে অনেকটা শিমের বিচির মতো। এর রং লালচে বাদামী এবং ওজন ১৪০ থেকে ১৬০ গ্রাম। প্রতিটি কিডনির অভ্যন্তরীণ বর্ডারের নিকট কিছুটা চাপা- আর এখানেই কিডনির ধমনী ও শিরা অবস্থিত। ধমনীর মাধ্যমে দৈনিক ১৭০০ লিটার পর্যন্ত রক্ত কিডনির ভেতরে প্রবেশ করে। এই রক্তকে ছেঁকে কিডনি তার শিরার মাধ্যমে তা আবার দেহের রক্ত সঞ্চলন সিস্টেমে বের করে দেয়। সুতরাং আমাদের কিডনিদ্বয় রক্ত থেকে অকেজো পানিসহ অন্যান্য বর্জ্য বের করে রক্তকে পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত আছে।

আমাদের কিডনিদ্বয়ের মূল কাজ হলো রক্তকে ফিলটার করে মূত্র তৈরী করা ও তা ব্লাডারে নিয়ে আসা। ইতোমধ্যে আমরা এ ব্যাপারে উপরে আলোচনা করেছি। কিন্তু কিডনির আরো কিছু কাজ আছে। তারা দেহের মধ্যস্থিত পানির মাত্রার ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে; ফলে দেহের টিস্যুতে সঠিক পরিমাণ পানি সর্বদা উপস্থিত থাকে। মনে করুন, আপনি একদিন খুব বেশী এবং পরদিন অতি অল্প পানি পান করলেন। এই অসামঞ্জস্যতা আমাদের কিডনি বুঝতে পারে ও প্রয়োজনীয় ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে যায়-

যাতে দেহের মধ্যে সঠিক পরিমাণ পানি বিদ্যমান থাকে। আমাদের হাড্ডির খোরাক হলো কেলসিয়াম। কিডনিদ্বয় রক্তের মধ্যে এই কেলসিয়ামের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে যাতে হাড্ডিগুলো সঠিক পরিমাণ কেলসিয়াম পায়। কিডনির আরেক কাজ হলো দেহের এসিড ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা। এর ফলে দেহের যাবতীয় প্রসেস সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কিডনিদ্বয় রক্তচাপকে নিয়মিতকরণে সাহায্য করে। কিডনির আরেক কাজ হলো লাল রক্তকোষ তৈরীতে দেহকে চেতনাশীল করে তোলা। লাল রক্তকোষই হলো রক্তের মৌলিক অংশ। এগুলো অক্সিজেন কোষে কোষে বহন করে নেয়। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে আমাদের কিডনিদ্বয়ের সঠিক কর্মক্ষমতা স্বাস্থ্যের জন্য কতো জরুরী। আসলে, কারো উভয় কিডনি যদি কাজ করে না- তাহলে বাঁচা মুশকিল হয়ে ওঠে। কোন উপায় না থাকলে মাত্র ক'দিনের ভেতরই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। আল্লাহ দরবারে শোকর যে, সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি কিডনিদ্বয় নষ্ট হয় না- এবং প্রয়োজনে একটি মাত্র কিডনি ভালো থাকলেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া আল্লাহ পাক মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, ফলে উভয় কিডনি নষ্ট হয়ে গেলেও মেশিন দ্বারা কিডনির মূল কাজ সারা যায়। এভাবে কিডনির কাজ সারাকে বলে ডায়ালিসিস। তবে এ উপায়ে খুব বেশীদিন কিডনির কাজ সারা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ- তাই, অপর কোন ব্যক্তির কিডনি 'ডোনার' হিসাবে পেলে তা দ্বারা কিডনি প্রতিস্থাপন বা ট্রান্সপ্লান্ট সম্ভব। আজকাল অনেক লোক এভাবে বেঁচে আছেন। আল্লাহর দরবারে আবারো শুকরিয়া।

৮. পুনর্জনন

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে (আঃ) যে উপায়ে সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে বার বার সৃষ্টি না করে এই উভয়ের মধ্যে এমন কিছু উপাদান দিয়েছেন যার ফরে কিয়ামত পর্যন্ত এদের বংশধর এই পৃথিবীর মাটিতে আসা-যাওয়া নিশ্চিত হয়েছে। নারীদেরকে দিয়েছেন গর্ভধারণের ক্ষমতা আর পুরুষদের মধ্যে দিয়েছেন গর্ভে সন্তান জন্মানোর উপাদান। নারীদের মধ্যে আছে ডিম্বকোষ আর একে ফার্টিলাইজ বা

ফলনশীলের জন্য দরকার পড়ে পুরুষের শুক্রকোষ। আর এই উভয় কোষের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয় আরেক নতুন মানবসন্তান। আল্লাহর কী অপরিসীম মহিমা! নারী-পুরুষ দ্বারা বংশবৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদানে তিনি উভয়ের মধ্যে এমন এক আকর্ষণীয় জিনিস সংযোজন করেছেন যে, যার আসল স্বরূপ আজো সঠিকভাবে জানা যায় নি। এই আকর্ষণের নাম প্রেম। আর প্রেমের একটি বহিঃপ্রকাশ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যস্থ যৌনাকর্ষণ।

পুনর্জনন ক্রিয়া মানুষের মধ্যে ঠিক কিভাবে সংগঠিত হয় জানা তথ্যাদির উপর এখন তা আলোচনা করছি। একটি শিশু কিভাবে মায়ের গর্ভে নারী-পুরুষের মিলন থেকে আত্মপ্রকাশ করে দীর্ঘ ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে বেড়ে ওঠে এক শুভমুহূর্তে এই ধরার বুকে জন্মলাভ করে তা জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের পরিচিতি সম্পর্কে অনেকটা বেশী ওয়াকিফহাল হবো- সন্দেহ নেই।

মানবশিশুর জন্মবৃত্তান্ত

ফলনশীল হওয়ার মাধ্যমে একটি মানবশিশুর জন্মবৃত্তান্তের শুরু। কোন নারী গর্ভধারণ করাকে ইংরেজীতে বলে ফার্টিলাইজেশন। মানবশিশুর জন্মবৃত্তান্তের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর শুরুতে গর্ভধারণ ক্রিয়াকে কিছুটা গভীরভাবে বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এরচেয়ে বেশী উন্মুক্ত হয় নি। এই কথাটি সবার নিকট স্পষ্ট হবে যতো বেশী পরবর্তী লেখাটুকু পাঠ করে অনুধাবন করবেন।

প্রিয়া পাঠক! আপনি ও আমি একটি মাত্র ফলনশীল বা ফার্টিলাইজ কোষের দ্বারা সৃষ্ট। যেই মুহূর্তে পিতার শুক্রকোষ ও মায়ের ডিম্বকোষ একত্রিত হয়ে যায় ঠিক তখনই মানুষের জন্মবৃত্তান্ত শুরু হয়। পুরুষের ও নারীর যৌনকোষ একেকটি বিশেষ ধরনের কোষ। আর এই কোষকে বুঝতে হলে আমাদেরকে মানুষের কোষের মৌলিক কিছু উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে।

মানবসৃষ্টির জেনেটিক কোড

আমাদের কোষের মূল উপাদানকে জিন বলে। জিন হলো পুনর্জননের জন্য তথ্য। যে বস্তু জিনকে কোষের মধ্যে বহন করে তাকে বলে ক্রমোজাম। মানবদেহের প্রতিটি কোষে মোট ৪৬টি ক্রমোজাম আছে। কিন্তু পুরুষের শুক্রকোষ ও নারীদের ডিম্বকোষের প্রতিটি ২৩টি মাত্র ক্রমোজাম দ্বারা সৃষ্ট। যেহেতু মানবদেহের অন্য সকল কোষের ক্রমোজামের মাত্রা ৪৬টি তাই যখন উভয় যৌনকোষ একত্রিত হয় তখন নতুন কোষের ক্রমোজাম সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ (২৩টি নারীর ও ২৩টি পুরুষের)। এই ৪৬টি ক্রমোজামে মানবদেহ সৃষ্টির যাবতীয় জেনেটিক কোড সংরক্ষিত থাকে।

ফলনশীলতা

নারীদের ডিম্বকোষ ফেলোপিয়ান টিউব নামক গর্ভাশয়ের নিকটবর্তী একটি পাইপে অপেক্ষারত থাকে। পুরুষের বীর্যকোষ সেখানে 'সাঁতার কেটে' আসার পর ডিম্বকোষের ভেতর ঢুকার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অসংখ্য কোষের মধ্যে মাত্র একটি ভেতরে প্রবেশ করে ফার্টিলাইজেন প্রসেস শুরু করে। এদিকে ডিম্বকোষ থেকে একটি স্নায়ু সিগনাল ব্রেনে যেয়ে পৌঁছে- অর্থাৎ গর্ভধারণ শুরু হয়েছে বলে নির্দেশ যায়। মস্তিষ্ক থেকে পাল্টা নির্দেশ আসে- অন্য কোনো বীর্যকোষ ডিম্বের ভেতরে প্রবেশের সকল রাস্তা বন্ধ করা হোক। সুতরাং ডিম্বকোষের দেওয়াল খুব শক্ত হয়ে যায়।
ফলনশীল হওয়ার সাথে সাথে ডিম্বকোষের কেন্দ্রে পড়ে থাকা ২৩টি ক্রমোজামের সঙ্গে শুক্রকোষের ২৩টি ক্রমোজাম একত্রিত হয়। ফলে মানবদেহের জন্য জরুরী পুরো ৪৬টি বা ২৩ জোড়া ক্রমোজাম কেন্দ্রে অবস্থান করে। এখন শুরু হবে কোষ বিভক্তি ক্রিয়া।

ভ্রূণের উন্নয়ন

ফলনশীল ডিম্বকোষের নাম এখন জায়গট (zygote)। এতে আছে মা ও বাবার জেনেটিক তথ্যসম্বলিত ২৩ জোড়া ক্রমোজাম। ফেলোপিয়ান টিউব থেকে ধীরে ধীরে ফার্টিলাইজ ডিম্বকোষটি গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এসময়ই কোষ বিভক্তি শুরু হয়। ফলনশীল হওয়ার মাত্র ত্রিশ ঘণ্টা পরই প্রথম বিভক্তি শুরু হয়ে যায়। আর বিভক্ত হওয়ার পরই জায়গটের নাম এখন ভ্রূণে পরিণত হয়। ৬ দিন ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে ভ্রমণ শেষে ভ্রূণটি গর্ভাশয়ে এসে এক সাইডের দেওয়ালে লটকে থাকে। ইতোমধ্যে কোষ বিভক্তির মাধ্যমে ভ্রূণের আয়তন অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠ দিনে ভ্রূণকে দেখতে বলের মতো লাগে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে গর্ভপরিস্রব বা ফুল সৃষ্টি শুরু হয়। ফুলের কাজ হলো ভ্রূণকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগান দেওয়া। এ পর্যায়ে ভ্রূণের তিনটি অংশের তিন ধরনের টিস্যু দৃশ্যমান হয়ে যায়। এসব টিস্যুর নাম হলো এন্ডোডার্ম, এক্টোডার্ম ও মেসোডার্ম। তৃতীয় সপ্তাহে স্নায়ু টিউব আত্মপ্রকাশ করে যা থেকে শিশুর ব্রেনসহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তৈরী হয়। এছাড়া বিভিন্ন পেশীর জন্ম হয় যা থেকে দেহের যন্ত্রাদি সৃষ্টি হবে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে এসে ভ্রূণের মধ্যে ধমনী, শিরা-উপশিরা ও পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন বস্তু আত্মপ্রকাশ করা শুরু করে। মাত্র ৩০ দিনের মাথায় এসে ভ্রূণের মধ্যে যাবতীয় প্রধান প্রধান দেহযন্ত্রের উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। এ সময় ভ্রূণের চোখ, বাহু, পা গজে উঠতে থাকে। এমনকি হৃদযন্ত্রের স্পন্দনও দৃশ্যে ভেসে আসে।

গর্ভধারণের ছয় সপ্তাহ পর ভ্রূণের দেহের হাড্ডি ও পেশী আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় মাসে এসে ভ্রূণকে ফিটাস বলে সম্বোধন করা হয়। এখন এটার মধ্যে একটি মুখমণ্ডল ও নাক তৈরী হয়ে গেছে। এছাড়া কানের আকারও স্পষ্ট। তৃতীয় মাসের শেষে অঙ্গুলি ও যৌনাঙ্গ সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন আলট্রাসাউন্ড দ্বারা বাচ্চা মেয়ে না ছেলে তা ধরা সম্ভব। এসময় শিশুর দৈর্ঘ্য ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং তার ওজন হবে প্রায় ১১৩ গ্রাম। শিশুর মুখমণ্ডল অনেকটা মানুষের মতোই লাগে। সুবহানাল্লাহ! এ ক'টি দিনে একটি কোষ থেকে এতো জটিল অসংখ্য কোষসর্বস্ব একটি

শিশু সৃষ্টি হয়ে গেল! আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত! বিজ্ঞানীরা বলেন, ঐ ২৩ জোড়া ক্রমোজামে যাবতীয় জেনেটিক তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে যা থেকে পুরো মানবদেহ মাত্র ৯ মাস কিংবা ১০ মাসের মধ্যেই গর্ভাশয়ে সৃষ্টি হয়ে যায়। এতো দ্রুত মানবশিশুর আত্মপ্রকাশ সত্যিই আল্লাহর জীবন্ত কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

ছেলে না মেয়ে

শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে একমাত্র পুরুষের উপর। তবে পুরুষের এ ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। বিজ্ঞানীরা বেশ আগে থেকে অবগত আছেন যে, ছেলেমেয়ে হওয়ার ব্যাপারটি পুরুষের শুক্রকোষ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর তা কেন হয়, আমরা এখনই প্রকাশ করে দিচ্ছি।

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মানুষের জিনে (অর্থাৎ পুনর্জনন জৈবিক কোডে) সর্বমোট ২৩ জোড়া ক্রমোজাম আছে। ২৩ নং জোড়াটি যৌনকোষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই জোড়াটিই নির্দিষ্ট করে নতুন শিশু ছেলে না মেয়ে হবে। নারী ও পুরুষের এই জোড়া ক্রমোজাম ভিন্ন। পুরুষের জোড়াটি দু'টি ভিন্ন ক্রমোজামের তৈরী যাদেরকে এক্স (ঢ) ও ওয়াই (ণ) বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু নারীদের জোড়ার উভয়টি শুধুমাত্র এক্স (ঢ) ক্রমোজাম। অর্থাৎ পুরুষের বীর্যে আছে একটি এক্স ও একটি ওয়াই- কিন্তু নারীদের ডিম্বের ক্রমোজাম দু'টিই এক্স। এতো গেল ক্রমোজামের মধ্যে ভিন্নতা।

একটি শিশু ছেলে না মেয়ে তা নির্ভর করে সে কোন্ জোড়া ক্রমোজাম মা-বাবা থেকে পেয়েছে। যেহেতু পুরুষের জোড়ায় আছে এক্স ও ওয়াই তাই এটা পেয়ে ছেলে হতে হলে একটি ওয়াই আসতে হবে পুরুষ থেকে ও একটি এক্স নারী থেকে। সুতরাং এই জোড়াটি হবে এক্স-ওয়াই- অর্থাৎ পুরুষ। শিশু যদি মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তাকে দু'টি এক্স পেতে হবে- একটি নারী থেকে আর একটি পুরুষ থেকে। সুতরাং এক্ষেত্রে জোড়াটি হবে এক্স-এক্স। মোটকথা নারী যেহেতু সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র এক্স যোগান

দেয় তাই শিশু ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়া কোন ক্রমেই নারীর উপর নির্ভর হবে না। অপরদিকে যেহেতু পুরুষের আছে এক্স ও ওয়াই- সে যেটাই যোগান দেবে সেটাই ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়ার জন্য দায়ী হবে। এক্স দিলে মেয়ে আর ওয়াই দিলে ছেলে। আশারাখি বিষয়টি সবার বোধগম্য হয়েছে।

৯. রোগ প্রতিরোধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবদেহকে সৃষ্টি করার সময় পারিপার্শ্বিকতায় তাঁরই সৃষ্ট অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় জীবী ও বাতাসের বিভিন্ন বস্তু দ্বারা দেহটি যাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন অতি সহজে না হতে পারে, সেটারও চিন্তা করেছেন। সুবহানাল্লাহ! দেহের ভেতরই একদল কোষ ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছেন, যাতে রোগ-ব্যাধি প্রদানকারী বিভিন্ন উপাদান যেমন রোগ জীবাণু কিংবা দেহের জন্য ক্ষতিকর কোন বস্তু ইত্যাদির উপর আক্রমণ চালিয়ে দেহকে ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখা যায়। যে সিস্টেম এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে তার নাম হলো রোগ প্রতিরোধ বা ইমিউন সিস্টেম।

আমাদের দেহে জীবাণু, ভাইরাস ও ছত্রাক জাতীয় রোগসৃষ্টিকারী উপাদান যাতে সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা দেহের চামড়া নিশ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু এরপরও রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর উপাদান দেহের ভেতর বিভিন্ন উপায়ে প্রবেশ করে ফেলে। সুতরাং আল্লাহ পাক দেহকে রক্ষার্থে দলে দলে কোষ, মলিকিউল এবং অরগ্যান বা দেহযন্ত্র তৈরী করেছেন যারা সবে মিলে আক্রমণকারী বস্তুকে ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত আছে। রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম কতটুকু সফল তার উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা।

আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দু' ধরনের। প্রথমটি হলো জন্মগত এবং দ্বিতীয়টি অভিযুজ্য তথা প্রয়োজনমাফিক। জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো সাধারণ- যেমনঃ চামড়া, অশ্রু, শ্লেষ্মা, থু-থু, কাটা-পোড়ার পর দ্রুত টিস্যু ফুলে ওঠা ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

হিসাবে কাজ করে। সুতরাং প্রাথমিক এসব জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের জন্য বিশেষ উপকারী। কিন্তু এরপরও এগুলো যথেষ্ট নয়। কারণ আত্মরক্ষার এই প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন যদি কোন ক্ষতিকর উপাদান অতিক্রম করে বসে- যা প্রায়ই ঘটে, তাহলে কী হবে? এ ক্ষেত্রে ওসব বিশেষ মলিকিউল, কোষ ও যন্ত্রাদি মিলে আরেক প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করে। এই ডিফেন্স সিস্টেম অনেকটা শত্রুর স্বরূপ-নির্ভর- অর্থাৎ বিশেষ শত্রুকে পরাজিত করার একটি নতুন উপায়। আর এখানেই শেষ নয়। অনুরূপ শত্রু দ্বারা আবারো আক্রান্ত হলে একই ভাবে ডিফেন্স তৈরীর একটি স্থায়ী ব্যবস্থাও রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম করে রাখে। সুবহানাল্লাহ! শেষোক্ত এই অভিযুজ্য ক্ষমতা আমাদের দেহে থাকার দরুনই স্থায়ী ভেসকিনেশন (টিকাদান) সম্ভব হয়।

অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের চারটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ আক্রমণকারী দেহে প্রবেশের পর এটা সক্রিয় হয়ে ওঠে- এর আগে নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা একমাত্র ঐ বিশেষ আক্রমণকারীকে হামলা করে। তৃতীয়তঃ প্রথমবার হামলার পর সফল হওয়ার পর এই ক্ষমতাটি সংরক্ষিত থাকে যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ আক্রমণকারীকে ধ্বংস করা যায়। বছরের পর বছর পর্যন্ত এই ব্যাপারটি সংরক্ষিত থাকে এবং দ্বিতীয়বার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তা আরো সফলতা অর্জন করে। চতুর্থতঃ এটা সাধারণ দেহ-বস্তুকে আক্রমণ করে না- শুধুমাত্র ওসব জিনিসই হামলার শিকার হয় যেগুলো নন-আত্ম (আমাদের দেহের নয়) বলে পরিচিত হয়।

অভিযুজ্য রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের দু'টি উপশাখা আছে। এগুলো হলো হিউমোরাল ও কোষ মধ্যস্থতাকারী রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া। প্রথম ধরনের প্রতিক্রিয়ার সময় এ্যান্টিবডি নামক এক ধরনের প্রোটিন দেহের তরল পদার্থ ও রক্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এসব প্রোটিন আক্রমণকারীর দেহে জড়িয়ে ধরে তাকে খতম করে ছাড়ে। হিউমোরাল প্রতিক্রিয়া কোষের বাইরে সংঘটিত হয়- যেমন জীবাণু এবং বিষাক্ত জিনিস ধ্বংসকরণ। এই একই প্রতিক্রিয়া কোষের ভেতর ভাইরাস প্রবেশেও বাধাদান করে থাকে।

যখন কোষ-মধ্যস্থতাকারী প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল হয় তখন, যেসব কোষ অন্য কোষকে ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে ওগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এরা বেপরোয়াভাবে কোষ ধ্বংসের কাজে লেগে যায় না- একমাত্র ওসব কোষকে তারা আক্রমণ করে ধ্বংস করে, যাদের ভেতর থেকে ক্ষতিকর 'এ্যন্টিজেন' (রোগ জীবাণুর মতো উপাদান) বেরিয়ে আসছে কিংবা যেসব কোষ নষ্ট হয়ে পড়েছে। সুবহানাল্লাহ! এভাবে বেছে বেছে কোষ ধ্বংসের ক্ষমতা এরা কোত্থেকে পেল? ঈমানদাররা এর জবাব জানে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব কোষ এরূপ 'বুদ্ধিসম্পন্ন' ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে আমাদের দেহকে সংরক্ষণের নিমিত্তে। শুধু তাই নয়- ক্যান্সারের মতো রোগ দ্বারা 'কপি' করা কিছু কোষকেও এরা ধ্বংস করে দিতে পারে।

১০. স্নায়ুতন্ত্র

আমাদের দেহকে একটি জ্যান্ত যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে যেয়ে বিভিন্ন অবস্থার সঠিক জবাব দিতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল তথ্যাদিকে আমাদের ব্রেনে পৌঁছিয়ে গবেষণা ও প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার দরকার। স্বেচ্ছাকৃত অনেক কাজকর্ম পূর্ণ করার জন্যও দরকার তথ্য আদান-প্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। যেমন আপনি ইচ্ছে করলেন, লাফ মারবেন। এই ইচ্ছাকে সম্পন্ন করার জন্য আপনার দেহের বিভিন্ন পেশীকে সক্রিয় করতে তুলতে হবে। এই সক্রিয়করণের নির্দেশ আসবে আপনার মগজ থেকে। অপরদিকে আপনি যদি দুর্ভাগ্যবশত কোনভাবে নিজের একটি পা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে ব্যথা অনুভব, জোড়া লাগা ও সুস্থ হয়ে ওঠা এসব কার্য সমাধানেও দরকার ব্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ। যে কৌশলে এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয় তাকেই বলে নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র।

আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র সত্যিই এক চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। কী অপূর্ব কৌশলে এটা সাজানো হয়েছে! আল্লাহর অসীম কৃপায় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র আমাদেরকে সাধারণভাবে বেঁচে থাকতে বিরাট সহায়তা করা। চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি বেদনা অনুভব না করতেন তাহলে কী হতো? কেউ আপনাকে হামলা করে একেবারে মৃত্যুপথযাত্রী করে ফেললেও আপনি

কিছুই বুঝতে পারতেন না। যা হোক, আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কিভাবে কাজ করে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

আমাদের দেহের নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্রে আছে মূল দু'টি শাখা: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রান্তিক (বাইর) স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক দেহযন্ত্র হলো মস্তিষ্ক ও মেরুরুজ্জ। এই শাখার কাজ হলো বাইর থেকে আগত সকল স্নায়বিক সংকেত প্রসেস ও সমন্বয়বিধান শেষে উপযুক্ত নির্দেশ (মটর) যথাস্থানে প্রেরণ করা। এছাড়া এখানেই সকল জটিল মস্তিষ্কজণিত ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হয় যেমন তথ্য সংরক্ষণ (মেমরী), বুদ্ধি, শিক্ষা এবং ভাব প্রকাশ ইত্যাদি। প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্রে আছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের দেহব্যাপী বিস্তৃত সকল স্নায়বিক টিস্যু (স্নায়ুকোষ)। এই তন্ত্রের দায়িত্ব হলো ইন্দ্রিয়লব্ধ সকল তথ্যাদি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বহণ করে নিয়ে আসা এবং মটর নির্দেশ যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং এই তন্ত্রের কাজ হলো দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সকল কমাণ্ড বা নির্দেশ মানা। দৈহিক বা ঐচ্ছিক মটর নির্দেশ যেমন কথা বলা বা হাটার জন্য কোন পেশীকে ক্রিয়াশীল করা, দৈহিক স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে আমাদের অনৈচ্ছিক মটর নির্দেশ যেমন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন, পরিপাক তন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় (অটোনোমিক) স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো কেন, কিভাবে হয় তা আমাদের জানা নেই। এসব মূলত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল যা আল্লাহর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। তাই আল্লাহ দেহের অনেক ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করেছেন যাতে এসব কাজে কোন ত্রুটি না হয়ে যায়। মনে করুন, আমাদেরকে যদি শ্বাস-নিঃশ্বাস নিতে সর্বদাই চেতনাশীল বা সতর্ক থাকতে হতো তাহলে অন্যান্য কাজে মনোযোগী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। একইভাবে আরো অনেক কার্যাদির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবে মানবিক অনেক ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। ঐচ্ছিক কার্য-কলাপ দ্বারাই আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়- ইবাদত করতে হয়। সুতরাং আমাদের

বাঁচিয়ে রাখার তথা দেহপিঞ্জরে আত্মাকে ধরে রাখার মৌলিক কলা-কৌশলের উপর আমাদের চেতনশীল নিয়ন্ত্রণ অতি অল্পই দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, প্রথমতঃ আমরা এই স্বাধীনতা পেলে নিজেদেরই ক্ষতি করবো এবং এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যও প্রকাশ পায় না।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে আবার দু'টি উপশাখায় ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথমটিকে বলে সমবেদী (সিমপাথেটিক) স্নায়ুতন্ত্র। একে 'যুদ্ধ করো না হয় ভাগো!' সিস্টেম বলা যায়। কারণ এই সিস্টেমের কাজ হলো অপ্রত্যাশিত কোন অবস্থার অবতারণা হলে চেতনশীল করা, দেহ টিস্যুকে জাগ্রত করে তোলা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি। অপরদিকে অনৈচ্ছিক (পারাসিমপাথেটিক) স্নায়ুতন্ত্র নামক দ্বিতীয় উপশাখার বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের চেতনা-বহির্ভূত যাবতীয় কাজ ধীর স্থিরভাবে আঞ্জাম দেওয়া যেমন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন রেইট কমানো, চোখের মণিকে সংকোচন করা, পরিপাকতন্ত্রের পরিচালন ইত্যাদি। এসব কাজে 'সুচিন্তিতভাবে' জড়িত এই স্নায়বিক শাখাকে কোন কোন সময় 'শান্ত ও চিন্তিত' স্নায়বিক সিস্টেম বলে সম্বোধন করা হয়। এই শান্ত সিস্টেমের মূল কাজ হলো এনার্জি সংরক্ষণ করা ও সঠিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব সুচিন্তিত পরিকল্পনা!

১১. উদ্দীপক রস (হর্মোন)

আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষার্থে দু'টি সিস্টেম কাজ করে। এর একটির নাম নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র। উপরে আমরা এ ব্যাপারে কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা ইন্দ্রিয়লব্ধ ও স্নায়বিক তথ্যাদি বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এসব তথ্যাদি প্রসেস করে সঠিক প্রতিক্রিয়া যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। এই সিস্টেমের মৌলিক কাজ হলো আমাদেরকে সক্রিয় ও চলনসই রাখা। আমাদের দেহের সবকিছু যেসব মৌলিক কোটি কোটি ইউনিটের দ্বারা সৃষ্ট তাকে বলে কোষ। কোষের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ ও একে অন্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষারও প্রয়োজন আছে। সুতরাং এটা সঠিকভাবে

আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাক কোষ থেকে কোষে তথ্যাদি আদান-প্রদানের একটি উন্নত ব্যবস্থা রেখেছেন। এই ব্যবস্থার আওতায় মৌলিক যে রসায়নিক উপাদান জড়িত তাকেই বলে হর্মোন। এগুলোকে দেহের কেমিক্যাল মেসেঞ্জার বা রসায়নিক বার্তাবাহকও বলা হয়। হর্মোন আমাদের দেহ কোষের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন টিস্যুর কার্যাদি কিভাবে ঘটবে তার উপর দিক-নির্দেশনা প্রদান, পুনর্জনন কার্যাদিকে সহায়তা দান এবং খাদ্য-থেকে-এনার্জি সৃষ্টির প্রসেসকে নিয়মিতকরণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত আছে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত শতাধিক ভিন্ন হর্মোন চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

হর্মোন দেহের কিছু বিশেষ গ্রন্থি কিংবা টিস্যুর মধ্যে উৎপাদিত হওয়ার পর তা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরিত হয়। একটি বিশেষ তন্ত্র যাকে বলে 'এন্ডোকট্রাইন সিস্টেম' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রন্থিসমূহ অধিকাংশ হর্মোন তৈরী করে। এসব গ্রন্থির মধ্যে পিটিউটারী, থাইরোইড, আরডিন্যাল গ্রন্থি এবং ডিম্বাশয় কিংবা (পুরুষের) অণ্ডকোষ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হর্মোন তৈরী করে রক্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তবে সকল হর্মোন এন্ডোকট্রাইন গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদন হয় না। যেমন ক্ষুদ্রান্ত্রের (বা ছোট্ট আঁতের) পিচ্ছিলকরণ মেমব্রেন (ঝিল্লি) কিছু হর্মোন ছেড়ে দেয় যার কাজ হলো প্যানক্রিয়াস নামক গ্রন্থিকে সজাগ করে দেওয়া যাতে সে পরিপাক রস (ইনসুলিন) সৃষ্টি করে ছেড়ে দেয়। অন্য আরেক দৃষ্টান্ত হলো প্লাসেন্টা (ফুল)। এই গ্রন্থিটি শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় মায়ের গর্ভাশয়ে থাকে। শিশুর ক্রমোন্নতি সাধনে এই ফুলও কিছু বিশেষ হর্মোন তৈরী করে।

আমাদের দেহের প্রধান কয়েকটি হর্মোন হলোঃ বৃদ্ধি হর্মোন- এটা পিটিউটারী গ্রন্থি দ্বারা সৃষ্ট, দেহের সর্বত্র এই হর্মোন কাজ করে এবং এটার দ্বারাই কোষ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যাদি সাধিত হয়, অন্য কথায় এই হর্মোনের ফলেই শিশু মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেড়ে ওঠে; ফলিকল-উদ্দীপক হর্মোন- পিটিউটারী গ্রন্থি দ্বারা সৃষ্ট এই হর্মোন যৌনগ্রন্থিসমূহে ক্রিয়া করে, এটার দ্বারাই নারীদের ডিম্বকোষ পরিপক্ক এবং পুরুষের বীর্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়; প্রলাকটিন হর্মোন- এই হর্মোনটি প্রসব শেষে নারীদের স্তনে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য দায়ী; আন্টাইডাইওরেটিক

হর্মোন- পিটিউটারী গ্রন্থি দ্বারা সৃষ্ট এই হর্মোন আমাদের কিডনিদ্বয়ের কার্যাদিতে উদ্দীপনা দান করে, যেমন পানি ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ; কালসিটোনিন হর্মোন- থাইরোইড গ্রন্থি এই হর্মোন তৈরী করে, এটা আমাদের হাড্ডির মধ্যে কেলসিয়াম জমা রেখে রক্তে কি পরিমাণ কেলসিয়াম থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করে; ইনসুলিন- এই হর্মোন প্যানক্রিয়াস দ্বারা তৈরী হয়, এটার কাজ হলো রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, এটার অভাবেই ডায়াবেটিস মেলিটাস নামক রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়; এসট্রোজেন- এই হর্মোন নারীদের পুনর্জনন সিস্টেমে ক্রিয়া করে, এটা তাদের ডিম্বাশয়ে সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারাই যৌন উদ্দীপনা ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়; টেস্টোসটেরন- এটা নারীদের এসট্রোজেনের মতো পুরুষের পুনর্জনন সিস্টেমে ক্রিয়া করে; এবং এরিথরোপয়েটিন - এই হর্মোন তৈরী হয় কিডনির ভেতর, এটা হাড্ডির মজ্জায় যেয়ে লাল রক্ত কোষ সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যোগায়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এই অধ্যায়ে দেহতত্ত্বের মৌলিক ফাংশন বা ক্রিয়ার উপর অনেক তথ্য তুলে ধরেছি। এ থেকে আশারাখি পাঠকরা উপকৃত হবেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে, আমাদেরকে জ্যান্ত রাখতে যেয়ে মহান রাব্বুল আলামীন খুব জটিল একটি দেহযন্ত্র তৈরী করেছেন। বিভিন্ন কৌশলে দেহের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এতো জটিল একটি দেহের প্রয়োজন কি ছিল? এর জবাবে বলতে হবে, মানুষকে আল্লাহ পাক আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানবদেহ ও যে কোন অন্য মেরুদণ্ডী জীবদেহ মূলত প্রায় একই কৌশলে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু মানবদেহে তিনি অতিরিক্ত কিছু উপাদান যুক্ত করেছেন এজন্য যে, এতে বন্ধী করে রাখবেন আত্মা নামক সূক্ষ্ম রহস্যময় জিনিস। আত্মার অস্তিত্বই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীবীর মর্যাদা প্রদান করেছে। মানুষের মধ্যে আত্মাই প্রদান করেছে উচ্চ চেতনা যার মাধ্যমে আমরা প্রভুর পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হতে পারি। আমাদের ইহলোকে কোত্থেকে আসা হলো আর কোথায় যাওয়া হবে এবং সর্বোপরি এখানে আসার কারণ কী- এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবার মতো যোগ্যতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা

অবশ্য দেহতত্ত্বের উপর শুধুমাত্র ভূমিকা-স্বরূপ কিছু বর্ণনা এ পর্যন্ত তুলে ধরেছি। আসলে আমাদের দেহ যে কী অত্যাশ্চর্য এক সৃষ্টি, তা আরো বেশী বোধগম্য হবে আমরা যখন দেহের কিছু বিশেষ যন্ত্রাদি ও উপাদানের উপর বিস্তারিত জানতে পারবো। পরবর্তী অধ্যায়ে ঠিক তা-ই আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর কুদরত: বিভিন্ন দেহযন্ত্র

আমাদের দেহের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আলাদা ইউনিট একত্রে কাজ করে যাচ্ছে- যার সমন্বয় ফলাফল হলো একটি জ্যান্ত-চলন্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবীর আত্মপ্রকাশ। অন্যকথায় একক কোষ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ যাবতীয় দেহযন্ত্র যেমন, মগজ, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র, বিভিন্ন গ্রন্থি, রক্ত ইত্যাদি সবকিছু মিলে আমাদেরকে জ্যান্ত একটি দেহ হিসাবে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে যার মধ্যে চেতনা সৃষ্টিকারী আত্মার মিশ্রণ ঘটতে পারে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে স্বীয় কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ও মানবদেহের উপর গবেষণা করার নির্দেশ তাই তিনি তাঁর পবিত্র কালামে পাকে দিয়েছেন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য। আমরা এই গ্রন্থে 'আকাশ-পৃথিবীর' উপর কোন গবেষণা করছি না- এ ব্যাপারে আমি 'ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা' শিরোনামে একটি বই লিখেছি। পাঠকরা তা সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এখানে এটা উল্লেখ্য যে, মানুষ শুধুমাত্র দেহযন্ত্র নিয়ে জ্যান্ত থাকতে পারে না- আকাশ-পৃথিবীর সার্বিক ডিজাইন, পরিকল্পনা ও কার্যকারিতাও বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। এ ব্যাপারে সহজে বোধগম্য একটি দৃষ্টান্ত হলো দেহের প্রতিটি কোষ ও টিস্যুর খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত 'অক্সিজেন' গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা।

অক্সিজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে থাকার পূর্বশর্ত হলো পৃথিবীর চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডল থাকার যোগ্যতা থাকা। কারণ আমাদের সৌরজগতেই আরো কিছু গ্রহ-উপগ্রহ আছে যেমন বুধ ও চন্দ্র, যাদের কোন বায়ুমণ্ডলই নেই। অপরগুলোর মধ্যে বায়ুমণ্ডল বেশী পাতলা কিংবা তাতে অক্সিজেন নেই ইত্যাদি। এরপর অক্সিজেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সূর্যালোক। সুতরাং সূর্য ও তার আলো থাকতে হবে। সূর্যের আলো বৃক্ষের সবুজ পাতায় পতিত হলে একটি কেমিক্যাল প্রতিক্রিয়া ঘটে যাকে বলে, সালোকসংশ্লেষণ। এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফলই হলো (বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে বৃক্ষের পাতা থেকে বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত) অক্সিজেন গ্যাস। সুতরাং অক্সিজেন

তৈরীর আরেক শর্ত উন্মোচন হলো- পৃথিবীতে সবুজ বৃক্ষ থাকতে হবে। আর বৃক্ষ থাকার জন্য দরকার উপযোগী পরিবেশ ইত্যাদি। এভাবে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুমেয় হবে যে, পুরো মহাবিশ্ব মূলত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখছে। আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ও মানুষের দেহ নিয়ে গবেষণার ইঙ্গিত কোন্ কারণে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে দিয়েছেন তা এখন আশারাখি পাঠকদের নিকট পরিষ্কার হয়েছে।

মানবদেহের মধ্যে যে ক'টি সুচিন্তিত তন্ত্র বিদ্যমান তার উপর পরিচিতিমূলক কিছু আলোচনা ইতোমধ্যে (প্রথম অধ্যায়ে) হয়েছে। এখন এই প্রত্যেকটি তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও রক্তসহ দেহ-পানীয় ইত্যাদির উপর আলোচনায় মনোনিবেশ হতে চাই। এগুলোর উপর গবেষণা থেকে আমরা মানবদেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঠিক স্বরূপ অনুধাবন করে বিস্ময়াভিভূত হবোই এবং এটাও আশা যে, এ থেকে আমাদের তাক্বদির খুলে যেতে পারে- আমরা প্রভুর আনুগত্যশীল বান্দার মর্যাদায় ভূষিত হয়ে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

১. মানব মস্তিষ্ক

মাথার খুলিতে সংরক্ষিত অপেক্ষাকৃত বড়ো আয়তনবিশিষ্ট আমাদের মগজ বা মস্তিষ্ক হলো সকল দেহযন্ত্রের রাজা। বলাই বাহুল্য, এই মগজ এতো জটিল ও বিরাট সংখ্যক কাজে নিয়োজিত আছে যে, এই আধুনিক যুগে এসেও আমরা এ সম্পর্কে সবকিছু জানতে সক্ষম হই নি। অনেক ব্যাপার এখনও আমাদের নিকট অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির কথা। এসব তথ্য ব্রেনে পৌঁছার পর গবেষণা শেষে ফলাফল হিসাবে আমরা, দেখা-ছোঁয়া-শোনা-স্বাদ ও গন্ধ পাওয়ার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। মগজের কোন্ অংশ কোন্ তথ্যটি গবেষণা করে তা জানা হয়ে থাকলেও ঠিক কিভাবে গবেষণা হয় তা এখনও কেউ জানতে পারে নি। শুধু বিজ্ঞান নয়- দর্শনও এসব ব্যাপার জানার জন্য ইতিহাসব্যাপী গবেষণা চালিয়ে আসছে।

কিন্তু ফলাফল হিসাবে এখনও পুরোদমে গ্রহণযোগ্য কিছু বেরিয়ে আসে নি। বাস্তবে যা এসেছে তাহলো স্ববিরোধী, অসামঞ্জস্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনেক থিওরী ও কল্পনাপ্রসূত মন্তব্য। আমরা এ প্রসঙ্গে ওসব দার্শনিক মতবাদ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না। শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী থেকে কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি- যাতে আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এসব কলা-কৌশল ও জটিল ব্যবস্থাবলী মহান রাব্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সৃষ্টি করেছেন।

মগজ হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মূল যন্ত্র। এটাই হচ্ছে আমাদের চলন, নিদ্রা, ক্ষুধা এবং প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য দায়ী- ফলে আমরা বেঁচে আছি। মন সম্পর্কিত অধিকাংশ ব্যাপার যেমন প্রেম, ঘৃণা, ভয়, রাগ, আনন্দ ও দুঃখ ইত্যাদি মগজ নিয়ন্ত্রণ করে বলে অনেকে মনে করেন- কিন্তু ঠিক কিভাবে করে তা আজো জানা যায় নি। আর ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, মগজের মধ্যে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও বাইর জগৎ থেকে অসংখ্য সিগনাল এবং তথ্যাদি আসে। এসব তথ্য গবেষণা ও ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমাদের মস্তিষ্কের। সব মিলিয়ে আমাদের মগজ আমাদেরকে দান করেছে চেতনা, ভাব ও বুদ্ধি।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ব্রেনের ওজন হলো ১.৩ কেজি। এতে আছে ১০০০ কোটি পরিমাণ স্নায়ুকোষ। এগুলোকে নিউরন বলে। এছাড়া মগজে আছে নিউরোলজিয়া (বা সহায়ক-টিস্যু) কোষ এবং রক্ত বহনকারী টিস্যু। দেহের সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হিসাবে পুরো মগজকে অত্যন্ত শক্ত মাথার খুলি ও অভ্যন্তরস্থ তিনটি ঢাকনি দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। এরপর একে পরিষ্কার কিছু পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সন্তরণ অবস্থায় রাখা হয়েছে এজন্য যে, এর অভ্যন্তরস্থ অংশ যাতে বিভিন্ন চাপের মুখেও অক্ষত থাকে ও এই পানীয়ের মাধ্যমে নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যস্থ রসায়ন দ্রব্যাদির যোগাযোগ রক্ষা হয়।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের মগজকে সংরক্ষিত রাখার সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে এজন্য যে, অতি সহজে যদি ব্রেন নষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে। সুতরাং সর্বদা ক্রিয়াশীল মগজের যাবতীয় ফাংশন যাতে

সুসম্পন্ন হয় তার জন্য সকল ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। এখন আমাদেরকে আরো একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন যে, ঠিক কিভাবে মগজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

কিভাবে মগজ কাজ করে

আসলে মগজ জটিল একটি স্নায়ুকোষের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে তার যাবতীয় কার্যাদি সারে। মগজের স্নায়ুকোষকে আগেই বলেছি নিউরন বলে। নিউরন থেকে নিউরনে দু'টি উপায়ে যোগাযোগ রক্ষা হয়: রসায়নিক ও বৈদ্যুতিক। ঠিক কিভাবে তথ্য নিউরনের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয় তা বুঝতে গেলে আমাদেরকে নিউরন কোষের উপর কিছু ব্যাখ্যামূলক আলোচনার দরকার।

সকল কোষের মতো নিউরন কোষের মধ্যে আছে চার্জ আয়োন (কোন এটম যদি অপর এটমকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে তবে তাকে চার্জড্ আয়োন বলে- অর্থাৎ এটা নিউট্রেল বা চার্জশূন্য নয়)। তিন ধরনের এটম চার্জ অবস্থায় নিউরনের ভেতর থাকে। এগুলো হলো পটাসিয়াম ও সোডিয়াম (উভয়টি ধণাত্মক চার্জড্ আয়োন) এবং ক্লোরিন (ঋণাত্মক চার্জড্ আয়োন)। তবে অন্য সকল কোষের তুলনায় নিউরনের মধ্যে একটি আলাদা গুণ আছে: এটা স্নায়বিক ইমপাল্‌স বা ঘাত সৃষ্টি করতে পারে। নিউরনের ভেতর চার্জ মূলত ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। এর কারণ হলো নেগিটিভ আয়োন ক্লোরিনের সংখ্যা অন্য দু'টি পজিটিভ আয়োনের তুলনায় বেশী। কিন্তু কোষের বাইরের চার্জ পজিটিভ। সুতরাং চার্জের মধ্যে এই ভিন্নতা হেতু 'সংরক্ষিত বৈদ্যুতিক এনার্জি' সৃষ্টি হয়ে থাকে- একে মেমব্রেন পটেনশিয়াল এনার্জিও বলে। সুতরাং এ পর্যন্ত নিউরন সম্পর্কে আমরা যা জানলাম তাহলো, এগুলো অন্যান্য কোষের মতোই তবে তাদের মধ্যে আছে স্নায়বিক ইমপাল্‌স সৃষ্টির ক্ষমতা। যখন কোন কারণে এসব কোষে ইমপাল্‌স সৃষ্টি হয় (তা দেহের কোন অংশ বা মগজের কোন অংশ থেকে হতে পারে) তখন এগুলো অন্য নিউরন হয়ে গন্তব্যস্থলে বৈদ্যুতিক সিগনাল হিসাবে যেয়ে পৌঁছে। ইমপাল্‌স সৃষ্টির কারণ হলো কোষের মেমব্রেনে (বা

কাভারিংয়ে) যখন দ্রুত রদবদল ঘটে। একে বলে ডিপোলারাইজেশন (ঋণাত্মক থেকে ধণাত্মক কিংবা ধণাত্মক থেকে ঋণাত্মক হওয়া)।

উপরে বর্ণিত ট্রান্সমিশনকে বলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন। নিউরন থেকে নিউরনে রসায়নিক ট্রান্সমিশনও ঘটে। আর এই উভয় ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান হয়। নিউরনের শেষ প্রান্তকে বলে এক্সন। এক্সনের মাথায় বৈদ্যুতিক সিগনাল পৌঁছার পর সেখানে মওজুদ থাকা কিছু রসায়ন-বস্তু জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এসব বস্তুকে বলে নিউরোট্রান্সমিটার। এগুলো প্রথম নিউরনের পার্শ্ববর্তী নিউরনের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ফাঁক আছে সেখানে যেয়ে পৌঁছে। এরপর পরবর্তী অতি নিকটস্থ নিউরনের কিছু প্রাপক রসায়নে সাড়া জাগে। এই জাগরণ থেকে সেই নিউরনে আরেকটি সিগনাল সৃষ্টি হয় ও তা পূর্ববর্তী নিউরনের মতো পরবর্তী নিউরনে বৈদ্যুতিক ও রসায়নিক সিগনাল প্রেরণ করে। এভাবে একটার পর আরেকটি নিউরন স্নায়বিক সিগনালটিকে উদ্দীপক স্থান থেকে গন্তব্যে নিয়ে পৌঁছে দেয়। সুবহানাল্লাহ! তথ্য দেহের ভেতর দিয়ে পরিচালনার কী অপূর্ব কৌশল! আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ যেসব তথ্যাদি বাইর জগত থেকে পেয়ে থাকি তা সবই উপরোক্ত উপায়ে নিউরন থেকে নিউরন হয়ে মগজে যেয়ে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছার পর মস্তিষ্ক এটাকে গবেষণা করে আমাদের চেতনায় ফলাফল প্রদান করবে। তথ্যটি যদি সম্পূর্ণ নতুন কিছু হয় তাহলে মেমরী কোষের মধ্যে এটা অন্তত ক্ষণস্থায়ী তথ্য হিসাবে সংরক্ষিত হবে। আর যদি তা পূর্বে মেমরীতে সংরক্ষিত তথ্য কিংবা এর কাছাকাছি কোন তথ্য হয়ে থাকে- যেমন পরিচিত একটি মুখ, তাহলে মেমরী কোষ জাগ্রত হয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে এই তথ্য মগজে সংরক্ষিত আছে। আমাদের চেতনায় সেই তথ্য ফিরে আসবে- তথা আমাদের স্মরণ হবে এবং মুখটি চিনে নিতে পারবো। এখানে চেতনা কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অনেকের ধারণা চেতনার কারণও আমাদের মগজ কিন্তু ঠিক কিভাবে আমরা চেতনাশীল হই তা এখনও জানা যায় নি। আমরা কোন বস্তু দেখি চোখের দ্বারা- কিন্তু চোখ আসলে কিছুই দেখে না! তার কাজ হলো সামনের দৃশ্যকে সঠিকভাবে ভেতরে নিয়ে স্নায়বিক সিগনালের মাধ্যমে তা মগজে পৌঁছে দেওয়া- ব্যস। এটাকে দেখা ও গবেষণার কাজ সম্পূর্ণরূপে মগজের-

চোখের নয়। কিন্তু মগজ ঠিক কিভাবে দেখে তা আজো জানা যায় নি। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বেলাও একই কথা- মগজে তথ্য পৌঁছার পর 'কে' তা অনুভব বা অনুধাবন করে তা কেউ জানে না। যা হোক, ব্যাপারটি আর জটিল করার ইচ্ছে নেই।

উপরে আমরা মগজের মধ্যে নিউরনের মাধ্যমে স্নায়বিক তথ্য বা ইমপাল্‌স কিভাবে চলে তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। কিন্তু ব্রেনের আসল কাজ হলো এসব তথ্যকে গবেষণা ও ব্যাখ্যা শেষে আমাদের চেতনায় নিয়ে যাওয়া- চেতনাকে সজাগ করে তোলা যাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি 'বুঝ' বা অনুধাবনযোগ্য অর্থ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা ব্রেনের এসব কার্যাদি গবেষণা করে অনেক ব্যাপার উন্মোচন করেছেন। একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো, আমাদের মগজের মূল দু'টি অর্ধ-গোলক (হেমিস্পেয়ার) এর কোন্‌টি কোন্‌ তথ্য নিয়ে গবেষণা করে তা নির্ভর করে আমরা ডানহাতি না বাঁহাতি।

দু'টি পদ্ধতিতে ব্রেনের কার্যাদির উপর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে দুর্ঘটনা বা অন্য কোনভাবে যদি মগজের কোন বিশেষ অংশ অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে এর কারণে রোগীর কোন্‌ কোন্‌ স্নায়বিক ক্ষমতা লোপ পায় তা তলিয়ে দেখা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো মগজকে কৃত্রিম উপায়ে সক্রিয় করে তার মধ্যে যে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা রেকর্ড করা। মাথার খুলির বিভিন্ন অংশে ইলেকট্রোড (বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহের বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরীকৃত তার) লাগিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাদি যেমন, চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বায় কৃত্রিমভাবে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে মগজকে সক্রিয় করে দেখা হয় কোন্‌ অংশে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এ থেকে জানা হয়ে যাবে কোন্‌ ক্রিয়ার সাথে কোন্‌ অংশ জড়িত।

একাধিক স্নায়ুকোষ বা নিউরন মিলে একেকটি কাজে নিয়োজিত থাকে। একই কাজে জড়িত সকল নিউরনকে বলে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র। এসব নিউক্লিয়াস একত্রে মিলে তৈরী হয়েছে ইন্দ্রিয়, মোটর (স্নায়বিক নির্দেশ) এবং অন্যান্য তন্ত্র। সুতরাং বিজ্ঞানীরা বেদনা, ত্বক, মোটর,

অলফেক্টুরী (জিহ্বা), দৃশ্য, শব্দ, ভাষা এবং অন্যান্য তন্ত্র কিভাবে কাজ করে তা জানতে এসব তন্ত্রে ফিজিক্যাল ও রসায়নিক রদবদল কিভাবে ঘটে সেটা মেপে দেখতে পারেন। ইতোমধ্যে বর্ণিত ইলেকট্রোড মাথার খুলিতে লাগিয়ে নিউরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাপার একটি পদ্ধতির নাম ইলেকট্রএনসেফালোগ্রাফি (ঊউএ)।

উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা থেকে জানা গেছে অধিকাংশ ডানহাতি মানুষের মস্তিষ্কের বায়ের অর্ধ-গোলক অঙ্ক, ভাষা এবং কথা বলা নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেস করে। ডানের অর্ধ-গোলক সঙ্গীত, জটিল-কঠিন দৃশ্য ও ভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে বাঁহাতিদের মগজের কাজ অনেকটা পরিবর্তনশীল।

চোখ ও দৃশ্য

আমাদের দৃশ্যতন্ত্র হলো দেহের মধ্যে একটি অগ্রগামী জটিল তন্ত্র। কারণ দৃশ্য বা দেখার মাধ্যমে আমরা যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করি তা অন্য কোন ইন্দ্রিয় যন্ত্র দ্বারা সম্ভব হয় না। দৃশ্য বা ভিশন হলো দেখার ক্ষমতা যার মধ্যে জড়িত রং, আকার, আয়তন, গভীরত্ব, অনুপুঙ্খ এবং তুলনা ইত্যাদি। অবশ্যই দৃশ্য বা দেখার জন্য চোখ ও মগজ এই উভয়টির প্রয়োজন। বস্তুর গায়ের উপর থেকে যখন আলোক রশ্মি পতিত হয়ে ফিরে আসে এবং তা আমাদের চোখে পৌঁছে তখনই দেখার কাজটি শুরু হয়। এসব প্রতিবিম্বিত আলোক রশ্মি চোখে ঢুকার পর তা বৈদ্যুতিক সিগনালে রূপান্তর হয়। প্রতি সেকেন্ড এরূপ কোটি কোটি সিগনাল চোখ থেকে অক্ষি স্নায়ুকোষের মাধ্যমে ব্রেনের দৃশ্য বহিরাবরণে (বা ভিজিয়্যাল করটেক্সে) যেয়ে পৌঁছে। মস্তিষ্কের কোষ তখন এসব সিগনালকে ছবিতে রূপান্তর করে।

ত্বক ও ছোঁয়া

ত্বক বা ছোঁয়া হলো আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি। ছোঁয়ার মাধ্যমে আমরা কোন বস্তুকে অনুভব করি। আমাদের ত্বকের মধ্যে অসংখ্য স্নায়ুর শেষাংশে ছোঁয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক ও রসায়নিক সিগনাল যা খুব

দ্রুত মগজে যেয়ে পৌঁছে। আমরা চোখ বন্ধ করে দুই হাতে একটি বস্তু ভালো করে ধরে হাত বুলিয়ে বলতে পারি এটা গোলাকার না অন্য কোন আকারের। এভাবে বস্তুর পরিচিতি পাওয়ার কারণ হলো- অসংখ্য বার আমরা অনুরূপ বস্তু চোখে দেখে ও ছুঁয়ে যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তা ব্রেনের মেমোরীতে সংরক্ষিত আছে। এখন না দেখেও সেই মেমোরী ব্যবহার করে আমরা একে সনাক্ত করতে পারি। তবে এখানে ব্যাপারটি অনুধাবনযোগ্য যে, ত্বক ইন্দ্রিয়ও অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের মতো তথ্য-সিগনাল পাওয়ার পর আমাদের ব্রেনই আসলে তা গবেষণা করে ও সঠিক ফলাফল আমাদের চেতনায় ও অনুভূতিতে জাগ্রত করে দেয়। শুরুতে কেনো আমি ব্রেনকে সকল দেহযন্ত্রের রাজা বলেছিলাম তা এখন হয়তো সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরবর্তীতে আরো ওঠবে।

কান ও শ্রবণশক্তি

কান একটি অত্যাশ্চর্য শব্দ প্রাপকযন্ত্র (রিসিভার)। এটি একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান। পোকা-মাকড়, সর্প ইত্যাদির কোন কান নেই। তবে তাদেরকে আল্লাহ পাক শোনার অন্য উপায় প্রদান করেছেন। যেমন সর্প মাটির মধ্যস্থ কম্পন থেকে বুঝতে পারে কেউ তার নিকট দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার ভেতরে বিশেষ ক'টি হাড্ডি আছে যেগুলো শব্দ তরঙ্গে কম্পন করে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্ট মাখলুকাতকে বিভিন্ন কৌশলে লালন-পালন করে যাচ্ছেন। মানুষের দু'টি উন্নত ডিজাইনের কর্ণ আছে। এগুলোর কাজ হলো শব্দ তরঙ্গকে সংগ্রহ করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া। এরপর শব্দকে কর্ণের মধ্যে কিছু সংস্কার, পরিবর্ধন ইত্যাদি থেকে শ্রবণ স্নায়ুর মাধ্যমে আমাদের মগজে পাঠানো হয়। আর মগজই আমাদেরকে শোনার অনুভূতি প্রদান করে।

আমাদের কর্ণের তিনটি আলাদা অংশ আছে। এগুলো হলোঃ বাইর কর্ণ, মধ্যম কর্ণ ও ভেতর কর্ণ। বাইর কর্ণ বলতে মাথার বাইরের দৃশ্যমান অংশ ও ভেতরের শ্রাবণিক নালাকে বুঝাচ্ছে। বাতাসে ভর্তি কানের পর্দা যেখানে আছে তাহলো মধ্যম কর্ণ। এখানে আরো আছে তিনটি ছোট্ট হাড্ডি- স্টিরাপ, কর্ণাস্থি ও হাতুড়ি। ভেতর কর্ণে আছে ঝিনুকের মতো

পেঁচানো একটি অংশ যার নাম ককলিয়া ও অর্ধবৃত্ত সদৃশ নালা। এই তিন অংশ মিলে শব্দ তরঙ্গকে প্রসেস করে ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়।

শব্দ তরঙ্গ বাতাস, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য মাধ্যমের উপর চলে। একটি কলিংবেল যখন বেজে ওঠে তখন সিরিজ তরঙ্গমালা বাতাসের মধ্যে কম্পন শুরু করে। এই শব্দ তরঙ্গ যখন আমাদের কানে পৌঁছে তখনই আমরা শ্রবণ করি। মানুষ তরল, কঠিন ও গ্যাসের মধ্যে ভ্রমণরত শব্দ তরঙ্গ শোনতে পারে ঠিকই। কিন্তু কোন কোন জীবজন্তু আছে যাদের একদল শুধুমাত্র মাটির মাধ্যমে চলন্ত শব্দ শোনতে পায়- আর আরেক দল আছে পানির মধ্যে শোনে। মানুষ কোন কোন সময় শব্দ শোনতে পায় অস্থি কন্ডাকশনের মাধ্যমে- অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ হাড্ডির উপর দিয়ে সরাসরি ভেতর কর্ণে যেয়ে পৌঁছে। এভাবে শোনার দৃষ্টান্ত হলো নিজেদের কথা শ্রবণ করা। নিজে নিজে কথা বলার ফলে আমাদের মাথার খুলিতে মৃদু কম্পন শুরু হয়। ফলে এ থেকেই ভেতর কর্ণের ধ্বনি-কাতর কোষগুলোতে নাড়া জাগে। তবে একজন স্বাস্থ্যবান সাধারণ ব্যক্তিকে এরূপ শ্রবণ শক্তির উপর খুব অল্পই নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু হাড্ডির মাধ্যমে শব্দের চলনকে কাজে লাগানো সম্ভব। যেমন কেউ যদি সম্পূর্ণই বধির হয়ে থাকেন তাহলে তার মাথার খুলিতে বিশেষ ধ্বনি-সাহায্যকারী যন্ত্র লাগিয়ে শব্দ শ্রবণের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এভাবে কাজ করবে কি না তা নির্ভরশীল ঠিক কোন কারণে তিনি বধির হয়েছেন সেটার উপর।

বাইর কর্ণ দ্বারা শব্দ সংগ্রহের পর এটা বাইর শ্রাবণিক নালা দিয়ে ভেতরের দিকে চলতে থাকে এবং কানের পর্দায় যেয়ে পৌঁছে। ফলে এটা কম্পন শুরু করে। এই কম্পন মধ্যম কর্ণের তিনটি হাড্ডির মাধ্যমে ভেতরের দিকে আরো অগ্রসর হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষেত্রবিশিষ্ট কর্ণ পর্দা থেকে কম ক্ষেত্রবিশিষ্ট তিনটি হাড্ডির মধ্যে শব্দ তরঙ্গ চলার সময় তা অনেকটা জড়ো হয়ে পড়ে ফলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায়। সর্বশেষ হাড্ডি স্টিরাপে পৌঁছার পর এটা শব্দের ফলে ককলিয়া ও অর্ধবৃত্ত সদৃশ নালায় থাকা পানীয় বস্তুতে কম্পন শুরু হয়। আর এ থেকেই শেষ পর্যন্ত স্নায়বিক কোষ সজাগ হয়ে ওঠে ও শব্দ তরঙ্গকে ইলেকট্রকেমিক্যাল সিগনালে

রূপান্তর করে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়- ফলে আমরা শ্রবণ করি। সুবহানাল্লাহ! শ্রবণ করার ক্ষমতা সৃষ্টিতে আল্লাহর কী অপূর্ব কৌশল! কী সুচারু ডিজাইন! পরিষ্কার, ভেজালমুক্ত যাবতীয় ধ্বনি শ্রবণের নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে এই জটিল ব্যবস্থা। শব্দের ধ্বনি আমাদের মস্তিষ্কে অনুভূত হয় ঠিকই- কিন্তু কিভাবে 'কে' শ্রবণ করে তার সঠিক জবাব বিজ্ঞান আজো জানতে পারে নি।

নাক ও গন্ধ

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা আমাদের মগজ দেহের রাজা এমনিতে হয় নি- সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যসহ আমাদের চেতনাও মূলত এই মগজের মধ্যে অনুভূত হয়- যদিও 'চেতনা' আসলে কি, তার জবাব পেতে ইতিহাসব্যাপী বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের গবেষণার শেষ নেই। ইন্দ্রিয়লব্ধ আরেক তথ্যসূত্র হলো আমাদের নাক। আমরা এর দ্বারা গন্ধ অনুভব করি, কথা বলায় কাজে লাগাই ও শ্বাস-নিঃশ্বাস নিই। এসব ব্যাপার সবার জানা। আমরা যদি স্বাদের সাথে গন্ধও অনুভব করতে অপারগ হতাম তাহলে কেমন হতো? তবে মহান আল্লাহ পাক গন্ধের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য কী অপরূপ কৌশল অবলম্বন করেছেন তার স্বরূপ একটু চিন্তা করে দেখুন।

আমরা যদি নাকের ডিজাইন নিয়ে ভাবি তাহলে দেখতে পাই এর মূল দু'টি অংশ আছেঃ দৃশ্যমান বাইর ও অভ্যন্তরীণ অংশ। নাক বলতে প্রথম অংশকেই বুঝায়। অভ্যন্তরীণ অংশের মূল দু'টি ছিদ্র আছে যার মাঝখানে একটি নরম হাড্ডি বিদ্যমান। শ্বাস গ্রহণের সময় নাকের নাসারন্দ্র দিয়ে যাতে ধুলো কিংবা বড় কোন বস্তু ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য সেখানে আছে অসংখ্য লোম। নাকের ভেতর উপরের দিকে একটি অংশ আছে যেখানে বেশ কিছু 'গন্ধ-কাতর স্নায়ু' বিদ্যমান। ভেতরে নেওয়া বাতাসের মধ্যে যে গন্ধ আছে তা ওসব স্নায়ু গ্রেফতার করে বৈদ্যুতিক-স্নায়বিক সিগনাল হিসাবে মগজে পাঠিয়ে দেয়। গন্ধ ইন্দ্রিয় আসলে কী তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। তবে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেসব রসায়নিক বস্তু আছে তা থেকে গন্ধের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা নিয়ে আমরা গবেষণা করতে পারি। এ

পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সাতটি আলাদা গন্ধ সনাক্ত করেছেন যা গন্ধ-কাতর স্নায়ুকোষ চিনতে পারে। এই সাতটি হলো: কর্পূরীয়, মিশ্‌ক, ফুলেল, মেন্থল (পেপারমিন্ট), উচ্চমার্গীয়, শিরকা এবং পচা। গন্ধের উপর আরো গবেষণা থেকে জানা গেছে, একই ধরনের গন্ধ এমন সকল বস্তুর মলিকিউল (এক বা একাধিক অণুর তৈরী ক্ষুদ্র অংশ) এর আকারও প্রায় একই ধরনের।

জিহ্বা ও স্বাদ

বিজ্ঞানীরা মানুষের মধ্যে চারটি স্বাদেন্দ্রিয় গুণ আছে বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো: মিষ্টি, ঠক, লবণ ও তিতা। যে কোন স্বাদযুক্ত বস্তুতে মূলত এই চারটির একটি কিংবা একাধিক গুণের মিশ্রণ ঘটে থাকে। স্বাদের দেহযন্ত্র আমাদের জিহ্বা, এছাড়া এটার আরেক কাজ হলো কথা বলায় সাহায্য করা। স্বাদ-প্রাপক কোষ আমাদের জিহ্বায় আছে যার কাজ হলো স্বাদকে সনাক্ত করা। সাধারণত মহিলাদের জিহ্বায় স্বাদ-প্রাপক কোষের সংখ্যা বেশী থাকে। জিহ্বা ছাড়াও স্বাদ-কাতর কোষ মুখ বিবরের তালু এবং অন্ননালীর উপরিস্থ গহ্বরেও আছে।

আমাদের জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের স্বাদ অনুভব করার কোষ বা বাড আছে। যেমন পেছনের অংশ দ্বারা তিক্ততা, সামনের মাথায় মিষ্টতা এবং লবণাক্ততা ও ঠক অনুভূত হয় জিহ্বার উভয় প্রান্তে। প্রত্যেক স্বাদ বাডে আছে ক্ষুদ্র ছিদ্র যার অপরপ্রান্তে স্বাদ স্নায়ুকোষ বিদ্যমান। এসব কোষ সরাসরি মগজে ইমপাল্‌স প্রেরণ করে। তবে প্রত্যেক স্বাদযুক্ত জিনিসকে প্রথমে তরল পদার্থ দ্বারা সিক্ত করতে হবে। এরপর তা স্বাদ-বাড সহজে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। যে বস্তু দ্বারা সিক্ত করা হয় তার নাম লালা। সুতরাং শুষ্ক জিহ্বায় কোন স্বাদ মিলে না- লালার প্রয়োজন। লালাগ্রন্থি নামক একটি গ্রন্থি এই কাজটি সারে। আমাদের মুখের নিম্নস্থ চোয়ালের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত।

আলহামদুলিল্লাহ! উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেই আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি কিভাবে ব্রেন পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে তা বুঝতে সক্ষম

হয়েছি। আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় মানুষের এসব ইন্দ্রিয় সাধারণত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে যায়। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে এগুলোর ক্ষমতা অনেকটা লোপ পায়। যেমন চোখের উপর পর্দা পড়ে, বা চল্লিশ পার হয়ে গেলে চোখের লেন্সের আকার রদবদল ক্ষমতা হ্রাস পায়, এতে আগের মতো সকল বস্তু তেমন স্পষ্ট দেখায় না; শ্রবণশক্তি কমে যায়; চামড়ার মধ্যে ভাজ পড়ে ফলে তা আগের মতো সেনসিটিভ থাকে না; এবং স্বাদ-গন্ধেও ভাটা পড়ে ফলে সবকিছুতে সে-ই স্বাদ-গন্ধ অনুপস্থিত মনে হয় ইত্যাদি। এসব ব্যাপার অবশ্য আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষনীয় যে, আমরা এই জগতে চিরদিনের জন্য আসি নি- মৃত্যু অনিবার্য এবং তা আসলে খুব নিকটে। বয়স বাড়ার দৈহিক চিহ্নসমূহ আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়ার্নিং মনে করতে হবে। সুতরাং আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে শৈথিল্য হবে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মৃত্যুচিন্তা বাড়িয়ে দিন ও আখিরাতের সে-ই কঠিন দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করুন।

স্মরণশক্তি

আমাদের মগজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে স্মরণ করা। মানুষ বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে- এর মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। মস্তিষ্কে তথ্য সংরক্ষণের দু'টি পর্যায় আছে। প্রথমটিকে বলে 'এনকোডিং'। এটা মূলত প্রাথমিক স্টেজে প্রাপ্ত তথ্যকে বৈদ্যুতিক-রসায়নিক সিগনালে রূপান্তরকে বুঝায়। এ কাজটি দেহের অসংখ্য স্নায়ুকোষ বা নিউরন সেরে নেয়। মোটকথা মগজ যাবতীয় তথ্যকে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক-রসায়নিক তরঙ্গ হিসাবে সনাক্ত করতে জানে। এভাবে এনকোড করা তথ্য থেকে আমরা মগজের ওয়াসিলায় একটি অনুভূতি বা বোধগম্য ফলাফল পাই যা আমাদের চেতনায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। তবে এখানেই শেষ নয়- আমাদের মগজ প্রাপ্ত এই তথ্যকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও করে থাকে। ফলে সময়ের ব্যবধানে একই তথ্যাদি একাধিকবার আমাদের চেতনায় ও অনুভূতিতে ফিরে আসে- এই ফিরে আসার নামই হলো স্মরণশক্তি।

সুতরাং বলা যায়, স্মরণশক্তি বা মেমোরী প্রসেসে তিনটি ব্যাপার জড়িত: এনকোড, সংরক্ষণ ও ফিরে পাওয়া। সুতরাং যখন কেউ সফলভাবে কোনো অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে সমর্থ হয় তখন বুঝতে হবে এই তিনটি ব্যাপারে কোন ত্রুটি হয় নি। পক্ষান্তরে স্মরণ করতে ব্যর্থ হলে যেমন, কোন ঘটনার বিশেষ কিছু তথ্য যদি ভুলে যাওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে উক্ত তিনটি পর্যায়ের কোথাও গড়বড় হয়েছে। শক্তি বেশী কিংবা কমই হোক, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণশক্তি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভেবে দেখুন, আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ও চলাফেরায় স্মরণশক্তি কতো জরুরী। কথা বলা, হৃদয়ঙ্গম করা বা বুঝা, লেখা ও পড়া এবং সামাজিকতায় স্মরণশক্তির ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। মোটকথা পারিপার্শ্বিকতায় আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে চলতে হলে স্মরণশক্তিকে কাজে লাগাতেই হবে। মুহূর্ত পূর্বের ও সুদূর অতীতের ঘটনা আমাদের মেমোরীতে সংরক্ষিত থাকে। প্রয়োজনে তা আমরা কাজে লাগাই। সুবহানাল্লাহ! একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায়, স্মরণশক্তির গুরুত্ব কতো অপরিসীম। আল্লাহ পাক অতি সুকৌশলে স্মৃতি নামক উপাদান আমাদের মস্তিষ্কে তৈরী করেছেন। কোষের মধ্যে সকল তথ্য সংরক্ষিত হয় এটা জানা থাকলেও স্মৃতিশক্তি ঠিক কিভাবে কাজ করে তা আমরা এখনও সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি।

ইতিহাসব্যাপী অসংখ্য দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, লেখক, গবেষক এবং অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীরা এই স্মৃতি শক্তির উপর কতো যে গবেষণা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশের মনে প্রশ্ন জাগে: ঠিক কিভাবে আমাদের মগজ তথ্য সংরক্ষণ করে? মানুষ কেনো কিছু তথ্য সহজেই স্মরণ করতে পারে কিন্তু অন্যগুলো পারে না? অনুশীলনের মাধ্যমে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি আদৌ সম্ভব কি? আমাদের মগজে স্মরণশক্তির ক্ষমতাই বা কতটুকু? এছাড়া আরো ভাবার বিষয় যে, স্মরণশক্তি আমাদের মধ্যে সময় সময় প্রতারণাও করে থাকে। কোন বিশেষ ঘটনা- যেমন একটি গাড়ি দুর্ঘটনা, প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রায়ই সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। অথচ এই সাক্ষীর বক্তব্যের উপর অপর কারোর বিরাট লাভ-ক্ষতি নির্ভর করতে পারে। দেখা গেছে, মানুষ কোন কোন সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাকে

সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিতেও পারে- অথচ এটা যে অলীক সে তা নিজেই জানে না।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য স্মরণশক্তিতে আমাদের মগজের ভূমিকার উপর বেশ কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। তারা বলেন, তাৎক্ষণিক স্মরণশক্তির স্থান ধ্বনির সঙ্গে সম্পৃক্ত এলাকায় বিদ্যমান। এই স্মরণশক্তি দ্বারাই আমরা কোন বস্তু দেখে বা শোনে সাথে সাথেই আবার স্মরণ করতে পারি। দৃষ্টান্ত হলো: আপনাকে কেউ কয়েকটি কথা বললো- আর আপনি একটু পরই এই কথাগুলো আবার হুবহু বলে দিলেন। কিন্তু এরূপ বলা সত্যিই ক্ষণস্থায়ী থাকে- এক ঘণ্টা কিংবা এর পর আর সেই কথাটি হুবহু বলা সম্ভব হয় না। পরবর্তী স্তরের স্মরণশক্তিকে বলে স্বল্পকালীন স্মৃতিশক্তি। এ শক্তির ফলে ঘণ্টা খানেক পর্যন্ত আমরা অনেক কিছু হুবহু মনে রাখতে পারি। এই স্মৃতি সংরক্ষিত হয় মগজের 'টেম্পোরেল লোব' নামক এলাকায়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ঠিক কোথায় সংরক্ষিত হয় তা আজো সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয়, টেম্পোরেল লোব, করটিক্যাল এলাকা ও মধ্যমস্তিষ্ক ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি সংরক্ষণ হয়। যে ভাবেই হোক না কেন, আমাদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি থাকাটা একান্ত জরুরী। আল্লাহ পাক খুব সূক্ষ্ম ও জটিল উপায়ে মগজের মধ্যে এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এছাড়া স্মৃতিশক্তির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য প্রদান করেছেন। এজন্য অনেকে পবিত্র কালামে পাক হিফজ করে ফেলেন কিন্তু অনেকের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এমন কিছু মানুষ পাওয়া যায়- যাদের মস্তিষ্ক স্মৃতি সংরক্ষণে এতোই পটু যে, কোনকিছু একবার শোনলে বা দেখলেই তা স্থায়ীভাবে থেকে যায়। এরূপ স্মরণশক্তিকে বলে 'ফটোগ্রাফিক মেমোরী'। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কম- তবে আমার জানা মতো দু'জন কুরআনে হাফিজ আছেন যারা মাত্র ১ মাসের মধ্যে সমস্ত কুরআন শরীফ হিফজ করতে সমর্থ হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

মগজ সম্পর্কে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। পুরো মানবদেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল এই যন্ত্রটি সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা এখনও চলছে এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় ভবিষ্যতেও চলবে। তবে

আমাদের জন্য এটুকু অনুধাবন উপকারী হবে যে, মগজ মূলত একটি প্রসেসিং যন্ত্র। এটা সৃষ্ট হয়েছে পুরো দেহের প্রায় সব ফাংশনকে নিয়ন্ত্রণ এবং বাইর জগত থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রসেস করে আমাদের অনুভূতিতে বোধগম্য চেতনা জাগ্রত করে দেওয়া। অর্থাৎ আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জাগতিক অস্তিত্বের অর্থ কী তা অনুধাবন করতে মগজ আমাদেরকে সহায়তা করে। এতে আছে খুব জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি সংরক্ষণ ক্ষমতা যার উপর নির্ভরশীল আমাদের দৈনন্দিন চাল-চলন। আল্লাহর পবিত্র দরবারে অশেষ শোকর যে, তিনি অনুগ্রহ করে সকল প্রাণীদের তুলনায় আমাদের মগজকে আলাদা গুণাবলীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এতে প্রদান করেছেন বিরাট ক্ষমতা- যার ফলে আজ আমরা মহাবিশ্ব এবং নিজেদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনুধাবন করতে পারছি। চিন্তাশক্তি, ভাব, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতাসহ অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ মূলত মগজের কারণেই আমরা করে থাকি। নিজেকে চিনতে ও আমাদের প্রভুকে চিনতে আমরা উদ্‌গ্রীব হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি এই উন্নত মগজের ফলে। এসব ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি ইতর প্রাণীদের মতো আমাদের মগজের শক্তি সীমিত থাকতো। আবারো উচ্চারণ করছি মহান আল্লাহর শেখানো প্রশংসাসূচক শব্দ, আলহামদুলিল্লাহ!

২. হৃদযন্ত্র

আগের অধ্যায়ে সর্বদা ক্রিয়াশীল এই গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। রক্ত সঞ্চলন তন্ত্রের উপর আলোচনা কালে রক্তের পাম্প হিসাবে হৃদযন্ত্রের উপর কিছু তথ্য স্বাভাবিকভাবেই বর্ণনা করেছি। তবে আমাদের এই যন্ত্রটির গুরুত্ব এতোই বেশী যে, মগজ নিয়ে আলোচনার পরই এর উপর বিস্তারিত বলা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি।

আমাদের হৃদযন্ত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরত কর্মক্ষম একটি অত্যাশ্চর্য পাম্প। এই যন্ত্রটির সৃষ্টি-কৌশল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তাই আদি কাল থেকেই মানুষ গবেষণা করে আসছে। বিশেষ করে হৃদযন্ত্রের রোগ-ব্যাধি হেতু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই হৃদরোগ থেকে বাঁচার

উপায় ও হৃদরোগ থাকলে উপযুক্ত প্রতীকার আবিষ্কারে হৃদয়কে ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে মগজ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করেছি। মগজ ও হৃদযন্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। এদেরকে যথাক্রমে কার্ডিওলজিস্ট ও নিউরোলজিস্ট বলে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এই উভয় ফিল্ডে গবেষণার মাত্রা কতো গভীরে যেয়ে পৌঁছেছে। আগেই বলেছি এই গ্রন্থে আমরা কঠিন দুর্বোধ্য মেডিক্যাল বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দাবলী যতটুকু সম্ভব পরিহার করে যাবো। হৃদযন্ত্রের কাঠামো ও ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আমাদের উদ্দেশ্য- তাই আসুন, সরল ভাষায় এই অপূর্ব যন্ত্রের উপর যা কিছু বিজ্ঞান জানতে পেরেছে তার উপর একটু সার্ভে করে দেখি।

হৃদযন্ত্রের কাঠামো ও ক্রিয়া

প্রথমেই আমাদেরকে হৃদযন্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে জানা দরকার। মানব হৃদযন্ত্র একটি ফাঁফা পানপাতা আকারের অরগ্যান যার আয়তন মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান হবে (উপরের ছবিটি দেখুন)। শক্ত পেশী দ্বারা তৈরী এই হার্ট সর্বদা একটি বিশেষ রেইটে স্পন্দন করে। এতে সে দেহের মধ্যে রক্ত পাম্প করতে থাকে। অক্সিজেনশূন্য রক্ত দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে উপরের শিরা ও নীচের শিরা হয়ে হৃদযন্ত্রের ভেতর প্রবেশ করে। এই রক্ত ডানের চেম্বারে জমা হয়। চেম্বারটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে এটা সংকোচ হতে থাকে- ফলে, রক্ত ট্রাইকাপসিড কপাটক (বাল্ব) হয়ে ডানের নিলয়ে প্রবেশ করে। রক্ত প্রবেশের পরই কপাটক বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং রক্ত আর একই পথে বের হতে পারে না। এদিকে ডানের নিলয় সংকোচ হয়ে রক্তকে জোর করে পালমোনারী শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই শিরার কাজ হলো রক্তকে ফুসফুসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। রক্ত শিরায় যাওয়ার পরই কপাটক বন্ধ হয়ে যায় যাতে একই পথে রক্ত ফিরে না আসতে পারে। শিরা হয়ে রক্ত ফুসফুসে যাওয়ার পর শ্বাসের মাধ্যমে নিয়ে আসা অক্সিজেন এতে যুক্ত হয়। ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত এসে বায়ের চেম্বারে এসে জমা হয়। এরপর এই চেম্বার সংকোচ হতে থাকে। ফলে রক্ত মিত্রেল কপাটক হয়ে বায়ের নিলয়ে প্রবেশ করে। এটা পরিপূর্ণ হয়ে গেলেই তা সংকোচ হওয়া শুরু করে, এদিকে মিত্রেল কপাটক বন্ধ হয়ে

যায় যাতে রক্ত পুনরায় বায়ের চেম্বারে ফিরে যেতে না পারে। বায়ের নিলয় সংকোচ হয়ে জোর করে অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে বামদিকের প্রধান ধমনীতে নিয়ে যায় এবং এরই মাধ্যমে পুরো দেহে রক্ত যেয়ে পৌঁছে। এদিকে রক্ত ধমনীতে পৌঁছার পরই প্রধান ধমনীর কপাটক বন্ধ হয়ে যায় যাতে রক্ত ফিরে আসতে না পারে। এভাবেই আমাদের হৃদযন্ত্র প্রত্যেকটি স্পন্দনের ভেতর রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া অব্যাহত রাখে। মায়ের গর্ভে শিশুর আবির্ভাব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম এভাবে পাম্প করে যায় আমাদের কর্মক্ষম অত্যাশ্চর্য এই হৃদযন্ত্র। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব কৌশল, আল্লাহর কুদরতের কী বিকাশ!

হৃদযন্ত্রের কপাটক

আমদের হৃদযন্ত্রের মধ্যে ৬টি আলাদা অংশ আছে। এর প্রথমটি হলো ৪টি উন্নতমানের কপাটক বা ভাল্ব। এদের কাজ হলো রক্তকে একদিকে চলতে দেওয়া এবং উল্টোদিকে আসতে বাধাদান। এগুলো রক্ত প্রবাহের দিকে খুব সহজে খুলে যায় কিন্তু বিপরীত দিকে যখন রক্ত থেকে চাপ সৃষ্টি হয় তখন এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই কপাটকগুলো না থাকলে হৃদযন্ত্র কোন ক্রমেই সঠিকভাবে রক্ত পাম্প করতে পারতো না। এখানেও আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটি নমুনা প্রকাশ পেয়েছে। হার্টের ভাল্বের ডিজাইনকে অনুসরণ করে আজকের প্রযুক্তিতে অনুরূপ অসংখ্য ভাল্ব তৈরী হয়েছে যেগুলো মেশিনারীতে লাগানো হয়ে থাকে।

হৃদযন্ত্রের ডানদিকে ও বামদিকে দু'টি করে কপাটক আছে। ডানের চেম্বারে রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কপাটক আছে যার নাম ট্রাইকাসপিড কপাটক। এছাড়া পালমোনারী শিরার মুখে আরেকটি কপাটক আছে। এটি শিরার ভেতর রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ের ধমনীর মুখে আছে প্রধান ধমনী কপাটক এবং বায়ের চেম্বার মুখে আছে মিত্রেল কপাটক। ডানের চেম্বারের মুখের কপাটককে ট্রাইকাসপিড এজন্য বলা হয় যে, এতে আছে তিনটি ঢাকনা। কিন্তু ডানের মিত্রেল বা বাইকাসপিড কপাটকের ঢাকনা দু'টি। অপর দু'টি কপাটকের মুখে অর্ধচন্দ্র সদৃশ তিনটি

করে ঢাকনা আছে। কী সুন্দর ডিজাইন! চারটি চেম্বার থেকে রক্ত যাতে সঠিক দিকে প্রবহমান থাকে তা নিশ্চিত করে এই কপাটকগুলো। সুবহানাল্লাহ!

হৃদযন্ত্রের পেশী

এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় মাইওকার্ডিয়াম বলে। আমাদের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের পেশী বলাই যথেষ্ট। এই পেশী সত্যিই শক্তিশালী। আর তা হওয়াও জরুরী কারণ, সারা জীবন একে প্রত্যেক মিনিটে ৭০ থেকে নব্বুই বার সংকোচন ও শিথিল হয়ে রক্ত পাম্প করতে হয়। পুরো হার্টের চতুর্দিকে এই পেশী বিদ্যমান। বিভিন্ন চেম্বারের দেওয়ালের পেশী অপেক্ষাকৃত কম চওড়া- তবে তা-ও শক্তিশালী। সর্বাপেক্ষা শক্ত পেশী আছে বায়ের নিলয়ের দেওয়ালে। এই চেম্বার থেকেই রক্ত শরীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেয়ে পৌঁছে। একজন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির হৃদযন্ত্রের পেশীর গাঢ়ত্ব ১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাইরের পেশী

হৃদযন্ত্র হলো সদা অস্থির অর্থাৎ স্পন্দনে রত একটি দেহযন্ত্র। একে তার সঠিক স্থানে মজবুত করে রাখা প্রয়োজন। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব কৌশলে তাকে রাখা হয়েছে তা একটু ভেবে দেখুন। মূল পেশী তথা হার্টের চতুর্দিকের দেওয়াল ও বাইরের যে পেশী দ্বারা একে বক্ষের হাড্ডির সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়েছে তার মাঝখানে কিছু জায়গা আছে। এখানে একটি পানীয় বস্তু রাখা হয়েছে যাতে হৃদযন্ত্র মুক্তভাবে পাম্পিং একশন করে যেতে পারে। মাঝখানে এই ফাঁক না থাকলে কিন্তু সমস্যা হতো। উভয় পেশী ঘর্ষণের শিকার হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতো। বাইরের পেশীকে বলে পেরিকার্ডিয়াম।

ভেতরের টিস্যু

রক্ত যাতে অতিরিক্ত বিপরীত (ফ্রিকশন) শক্তির সম্মুখীন না হয়ে দ্রুত প্রবহমান থাকে তার নিশ্চয়তা দানে পেশীর অভ্যন্তরে একটি লাইনিংয়ের

মতো সাদা টিস্যুর তৈরী লেপ দেওয়া আছে। একই ধরনের টিস্যু সকল ধমনী, শিরা ও উপশিরার অভ্যন্তরে বিদ্যমান। এই লাইনিং না থাকলে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হতো। এছাড়া লাইনিং হেতু রক্ত জমাট বেধে সমস্যার সৃষ্টিও করে না।

করোনারী আরটারী

হৃদযন্ত্রের শক্ত পেশী সর্বদাই কাজে জড়িত আছে তাই তার এনার্জি তথা খাদ্যের প্রয়োজন। দেহের সকল বস্তুর মতো এই পেশীও কোষের তৈরী। সুতরাং প্রতিটি কোষের খাদ্য হিসাবে অক্সিজেন দরকার। হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করে নিয়ে যায় কোষে কোষে। এই রক্তের মধ্যে আছে অক্সিজেন যা কোষ ব্যবহার করে এনার্জি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়। হৃদযন্ত্রের পেশীতে অতিরিক্ত অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত করতে হবে। এই কাজে জড়িত আছে একদল ধমনী যাদেরকে বলে করোনারী আরটারী। দেহে পাম্পকৃত ৫% রক্ত এসব আরটারীতে প্রবেশ করে হৃদযন্ত্রের পেশীকে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়। এই আরটারীতে সমস্যা দাঁড়ালে পেশীতে রক্ত সাপ্লাই নিশ্চিত হবে না- আর এটাই হলো হার্ট এটাকের মূল কারণ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখুন। আ-মীন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের হৃদযন্ত্রের উপর উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো কিছু অবগত হতে পারলাম। আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় আমাদের অধিকাংশের হৃদযন্ত্র সারাজীবনই তার ডিউটি বিনা সমস্যায় পালন করে থাকে। অবশ্য হার্ট একটি পাম্প- কিন্তু সে জীবনচলার ক্ষেত্রে আমাদের রক্তের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে তারতম্য ঘটে তা-ও বুঝতে পারে এবং সাথে সাথে সঠিকভাবে জবাবও দেয়। যেমন মনে করুন, আপনি কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে ইচ্ছা করলেন। এসময় আপনার দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোষে কোষে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের হৃদযন্ত্র তা সনাক্ত করে নেয় খুব দ্রুত ও সে স্পন্দন রেট বাড়িয়ে অতিরিক্ত রক্ত পাম্প করে দেয়। অপরদিকে ঘুমন্ত অবস্থায়

সর্বাপেক্ষা কম চাহিদা থাকায় হৃদযন্ত্র পাম্পিং একশনও কমিয়ে আনে। এছাড়া ওঠা-বসা-চলার সময় রক্তের প্রয়োজনীয়তায় তারতম্য ঘটে। হৃদযন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি এসব রদবদল সনাক্ত করে নেয় ও সঠিকভাবে পম্পিং একশনে তারতম্য ঘটায়।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে, হার্টের পেশীর সংকোচন ও শিথিল তথা স্পন্দন মূলত হার্টের মধ্যে কিছু বিশেষ কোষ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। এসব কোষের কাজ হলো অবিরাম বৈদ্যুতিক সিগনাল হার্টের পেশীতে প্রেরণ করা। এটাকে হৃদযন্ত্রের পেসমেকার বলে। মানুষের হার্টের এই সিগনালকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করা যায়। এ যন্ত্রকে বলে ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাফ। হৃদযন্ত্রের উপরে চামড়ার মধ্যে কয়েকটি ইলেকট্রোড (ইলেকট্রিক্যাল তার) লাগিয়ে হার্টের স্পন্দন গ্রাফের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয়- এই ছবিকে বলে ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাম (ঊঈএ)। অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন মানে হার্টের মধ্যে কোন সমস্যা আছে। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। ডাক্তাররা বলেন, হার্টকে কর্মক্ষম ও রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া সুষ্ঠু রাখতে আমাদেরকে সর্বদাই ব্যায়াম করা জরুরী। সুফি-দরবেশরা সর্বদাই এই হার্ট বা কল্‌বের দিকে খিয়াল রেখে আল্লাহর জিকিরে রত থাকেন। এতে তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি বিরাজ করে। আমার ধারণা জিকির আর বিশেষ করে জিকিরে জলি (সজোরে জিকির) থেকে হৃদযন্ত্র সবদিক থেকে উপকৃত হয়। ফলে এতে সুস্থতা বিরাজ করে যা সুফিরা বলেন, উপলব্ধি করেন। অবশ্য হার্টের দিকে খিয়াল রেখে জিকিরের আসল ফলাফল হলো আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে সহায়তা। কারণ আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন: "আল্লাহর জিকিরে কল্‌বের মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করে"।

৩. ফুসফুস

আগের অধ্যায়ে শ্বাস-নিঃশ্বাস ক্রিয়ার উপর বর্ণনাকালে ফুসফুসের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আমরা এ থেকে এটুকু জানতে পেরেছি যে, ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশকৃত অক্সিজেন গ্যাস রক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্ত শরীরে চলে যায় এবং দেহের কোষ থেকে বর্জ্য হিসাবে নিঃসৃত ক্ষতিকর কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস ফুসফুসে আসার পর আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে

তা বাইরে নিয়ে এসে ফেলে দেই। ফুসফুসের এটাই মূল কাজ। তবে সুকৌশলে নির্মিত এই দেহযন্ত্রের উপর অনেক ব্যাপার এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হিসাবে উপরে বর্ণিত মগজ ও হার্ট ছাড়াও দেহের মধ্যে আরো অনেক যন্ত্র আছে যেগুলোর সৃষ্টিকৌশল ও কার্যকলাপ তলিয়ে দেখলে আমরা বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারি না। এ ক্ষেত্রে ফুসফুসও অত্যাশ্চর্য যন্ত্র হিসাবে কোনো দিকেই কম দাবী রাখে না।

ফুসফুসের কাঠামো

আমাদের পাঁজর পিঞ্জরের অধিকাংশ স্থান ফুসফুস দখল করে রেখেছে। এর একদিকে আছে স্কন্ধের অস্থি ও অপরদিকে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা। জন্মের সময় আমাদের ফুসফুসের রং ছিলো উজ্জ্বল গোলাপী- কিন্তু বয়স হওয়ার সাথে এর রং বদলে ধূসর বর্ণ ধারণ করে নেয়। এর কারণ হলো বাতাসের মধ্যে দূষণীয় দ্রব্যাদির অস্তিত্ব।

অসংখ্য বায়ু-টিউব হয়ে বাতাস ফুসফুসের ভেতর প্রবেশ করে। আর বাইর থেকে অবশ্য নাক ও মুখবিবর হয়ে বাতাস ফুসফুসে যায়। নাক বা মুখবিবর থেকে বাতাস গলনালী হয়ে শ্বাসনালীতে পৌঁছে। বুকের মধ্যে শ্বাসনালী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উভয় (ডান ও বামের) ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পরিণত বয়স্ক লোকের ফুসফুস ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। বায়ের (হার্টের দিকের) ফুসফুস দু'টি অংশে বিভক্ত: উপরের ও নীচের অংশ (লোব)। ডান দিকের ফুসফুস বায়েরটি থেকে কিছুটা বড়ো। এতে আছে তিনটি অংশ: উপর, মধ্যম ও নীচের অংশ। উভয় ফুসফুসের মাঝখানে আমাদের হৃদযন্ত্র, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, ধমনী ও শিরা অবস্থিত। একটি পাতলা পর্দা দ্বারা উভয় ফুসফুস আবৃত।

ফুসফুসের পাইপ বা ব্রংকিওলের শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পাইপের মাথায় এগুলোর ব্যাস ১.০২ মিলিমিটার থেকেও কম। এরপর আরো ক্ষুদ্র হয়ে তৈরী হয়েছে ফুসফুসের স্থলী। উভয় ফুসফুসে এরূপ ক্ষুদ্র ৩০ থেকে ৪০ কোটি করে স্থলী আছে। উভয়

ফুসফুসের স্থলীর মোট সারফেস (বাইরের) ক্ষেত্রফল ৯৪ স্কোয়ার মিটার- যা আমাদের চামড়ার ক্ষেত্রফলের তুলনায় ৫০ গুণ বেশী। বায়ু-টিউব বা পাইপ নেটওয়ার্ক ছাড়াও ফুসফুসের মধ্যে আরো আছে বিরাট শিরা-উপশিরার জাল। প্রতিটি স্থলীকে ঘিরে রেখেছে অনেক ক্ষুদ্রকায় উপশিরা বা ক্যাপিলারী। এগুলো ধমনী থেকে রক্ত সংগ্রহ করে শিরার মধ্যে নিয়ে যায়। সবগুলো ধমনী একত্রিত হয়ে পালমোনারী ধমনী তৈরী হয়েছে। আর সবগুলো শিরা একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে পালমোনারী শিরা। এ উভয় রগ হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে যুক্ত করে রেখেছে।

শ্বাসক্রিয়া

শ্বাসক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে অর্থের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটির অর্থ হলো শ্বাস-নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন পুরো দেহের প্রতিটি কোষে নিয়ে পৌঁছানো আর দ্বিতীয়টির অর্থ বাইর থেকে বাতাসের মাধ্যমে ফুসফুসে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া ও কার্বন ডাইওক্সাইড বের করে আনা। প্রথমটির অর্থ ব্যাপক ও দ্বিতীয়টির অর্থ সীমিত। সুতরাং শ্বাসক্রিয়া বলতে শ্বাস নেওয়া, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন রক্তে মিশানো, রক্তকে বহন করে টিস্যু ও কোষে পৌঁছানো ইত্যাদি বুঝায়। শ্বাসক্রিয়া কোষের নিজস্ব শ্বাসক্রিয়া বা এরোবিক রেসপিরেশনের জন্য জরুরী। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি কোষ অক্সিজেন ও বিভিন্ন জৈবিক পদার্থ কাজে লাগিয়ে এনার্জি মলিকিউল তৈরী করে যার নাম এডেনোসাইন ট্রাইফসফেট (এটিপি)। এরোবিক শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন দ্বারা গ্লুকোজকে বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে বদলানো হয়- এতে কার্বন ডাইওক্সাইড বর্জ্য উপাদান হিসাবে সৃষ্টি হয়। এই বর্জ্যকে দেহের ভেতর থেকে দ্রুত বহিষ্কার করতে হবে। এই কাজটি সারতে রক্ত তা বহন করে ফুসফুসে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়। আমরা তা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বের করে ফেলি।

আমাদের দেহের কোষ অবিরাম অক্সিজেন ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং তৈরী করছে বিষাক্ত কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস ফলে, ফুসফুসও অক্সিজেন সাপ্লাই ও কার্বন ডাইওক্সাইড নিঃসৃত করার নিশ্চয়তা প্রদানে অবিরত কাজে নিয়োজিত আছে, কখনও থেমে নেই। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি প্রতি

মিনিটে তাই ১৪ থেকে ২০ বার শ্বাস-নিঃশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু কঠিন ব্যায়াম অবস্থায় এই রেট ৮০ পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছতে পারে। আমাদের ফুসফুসে যে বাতাস ঢুকে তার সম্পূর্ণটাই কিন্তু অক্সিজেন নয়। মাত্র ২১ শতাংশ অক্সিজেন থাকে ও ০.০৪ শতাংশ কার্বন ডাইওক্সাইড। যে বাতাস নিঃশ্বাসের মধ্যে বেরিয়ে আসে তাতেও অক্সিজেন থাকে ১৪ শতাংশ এবং কার্বন ডাইওক্সাইড ৪.৪ শতাংশ। সুতরাং বলা যায় আমাদের ফুসফুস একটি গ্যাস বিনিময় যন্ত্র।

আলহামদুলিল্লাহ্! ফুসফুসের উপর আমাদের গবেষণার স্কোপ এই গ্রন্থে আর বাড়ার সুযোগ নেই। তবে আমি আশা করি পাঠকরা এ থেকেই ফুসফুসের আসল ক্রিয়ার উপর অনেকটা ওয়াকিফহাল হয়ে গেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হিসাবে এই ফুসফুসের গ্যাস বিনিময় কাজটি লক্ষ্য করার ব্যাপার। পুরো দেহে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত ও কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত করতে যেয়ে আমাদের ফুসফুস অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি আমাদের চেতনা লোপ পেলে যেমন ঘুমন্তাবস্থায়ও ফুসফুস বাইর থেকে বাতাস টেনে ভেতরে নিয়ে যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজ অবিরাম চলতে থাকে। আর মৃত্যু মানে শেষ নিঃশ্বাস। অক্সিজেন নেওয়ার সময় 'আল্লাহ' নাম এতে সংযুক্ত করা ও কার্বন ডাইওক্সাইড ছাড়া তথা নিঃশ্বাসের সময় 'হু' শব্দ সংযোগ করার মধ্যে বিরাট ফায়দা আছে বলে সুফিয়ায়ে কিরাম বলে থাকেন। এই 'পাস-আনফাস' জিকির খিয়ালের মাধ্যমে করা হয়। সুবহানাল্লাহ এভাবে অভ্যেস করে নিলে- এক মুহূর্তও আর আল্লাহর স্মরণ থেকে আমরা গাফিল থাকতে পারবো না। আর এই ওয়াসিলায় হয়তো শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগের সময় হুঁশ না থাকলেও আল্লাহর পবিত্র নামটিসহ মৃত্যু ঘটবে। এর চেয়ে বড় ফায়দা কী হতে পারে। সুতরাং আমি আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, তিনি যেনো সবাইকে দমের জিকিরে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করেন। আমীন।

৪. যকৃৎ বা লিভার

যকৃৎকে সাধারণ ভাষায় কলিজা বলে। মানবদেহের সর্বাপেক্ষা বড়ো দেহযন্ত্র এই কলিজা একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এটি মোট ৫০০টি ভিন্ন কাজে জড়িত। আর এদের প্রায় সবগুলোই আমাদের জীবনরক্ষার্থে জরুরী।

যকৃতের কাঠামো

মানব যকৃৎ একটি গাঢ় বাদামী রংয়ের স্পন্‌জের মতো যন্ত্র। পেটের উপরিভাগে ডান দিকে ডায়াফ্রামের নীচে এর অবস্থান। আমাদের পাঁজর পিঞ্জরের নীচের অংশ যকৃৎকে দুর্ঘটনাজণিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে রেখেছে। একজন পরিণত বয়স্ক লোকের লিভার প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। আর এর গাঢ়ত্ব ১৫ সেন্টিমিটার হবে। লিভারের অসংখ্য কাজ থাকা সত্ত্বেও এটি মূলত কাঠামোগতভাবে খুব সাধারণ একটি যন্ত্র। এতে আছে দু'টি মূল অংশ: ডান ও বায়ের অংশ। এগুলোকে লোব বলে। ডানের লোব আবার আরো দু'টো উপলোব দ্বারা সৃষ্ট। এদেরকে বলে কুয়াড্রেট ও কোডের লোব।

প্রতিটি লোবে আছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ইউনিট। এগুলোকে বলে লবিউল। প্রায় ১ মিলিমিটার চওড়া এসব লবিউল ছয়-সাইড বিশিষ্ট বস্তু। ক্ষুদ্র একেকটি রগ এসব লবিউলের ভেতর দিয়ে চলে গিয়ে প্রধান শিরা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই শিরার মাধ্যমেই রক্ত লিভার থেকে বেরিয়ে আসে। যকৃতের কোষ দেখতে অনেকটা ঘনক্ষেত্রের (অর্থাৎ কিউব বা বাক্সের) মতো লাগে। এসব কোষ ঐ লবিউলের ক্ষুদ্র শিরার চতুর্দিকে একটি বিশেষ উপায়ে অবস্থিত আছে। লবিউলের বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র, উপশিরা এবং ধমনী আছে। এসব মিলে লবিউলের মধ্যে পানীয় আদান-প্রদান করে। লিভার তার কাজ সারার সময় পুষ্টিকর পদার্থ সংগ্রহ, বর্জ্য বস্তু সরানো এবং রসায়নিক দ্রব্যাদি দেহের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার ক্রিয়া উক্ত উপাদানসমূহের মাধ্যমে আঞ্জাম দেয়।

অন্যান্য দেহযন্ত্র সাধারণত একটি সূত্রে রক্ত সংগ্রহ করে। কিন্তু যকৃৎ তার রক্ত সাপ্লাই দু'টি সূত্রে পেয়ে থাকে। হার্ট থেকে ফ্রেস অক্সিজেন-সর্বস্ব রক্ত প্রধান শিরা হয়ে লিভারে প্রবেশ করে। এই সূত্রে লিভারের মোট রক্তের ২৫% আসে। কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত লিভারে অপর একটি সূত্রে আসে আর তাহলো, হিপাটিক পরটেল ভেইন। এই রক্তনালীর মাধ্যমে লিভারে ৭৫% রক্ত আসে পরিপাক রাস্তা থেকে। এই রক্তে তাই খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিকর দ্রব্যাদি থাকে। এসব দ্রব্যাদি লিভারে আসার কারণ হলো এগুলোকে আরো পরিপাক ও জমা রাখা। লিভারে প্রতি মিনিটে ১.৪ লিটার পরিমাণ রক্ত যাওয়া-আসা করে। যকৃতের মূল শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃদযন্ত্রে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

যকৃতের কাজ

আগেই বলেছি অতি সাধারণভাবে নির্মিত এই দেহযন্ত্র আশ্চর্য কর্মক্ষমের অধিকারী। সে অন্তত ৫০০ বিভিন্ন কাজে জড়িত। তবে তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো এনার্জি সংরক্ষণ করে রাখা। গ্লুকোজ দ্বারা সৃষ্ট গ্লাইকোজেন নামক এনার্জির স্টোররুম হলো আমাদের লিভার। যেই মুহূর্তে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বেশী হবে তখন লিভার তা সরিয়ে নিয়ে আসবে। যে উপায়ে সে এই কাজটি সারে তাকে বলে গ্লাইকোজেনেসিস। যেই মুহূর্তে রক্তের গ্লুকোজ লেবেল দেহের চাহিদার তুলনায় কমে আসবে তখন লিভার স্টোর করা গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে। সুতরাং লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো অতিরিক্ত গ্লুকোজ হলে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে জমা রাখা আর গ্লুকোজের মাত্রা কমে গলে সেই জমাকৃত গ্লাইকোজেনকে আবার গ্লুকোজে পরিণত করে রক্তে যুক্ত করা। এ উপায়ে আল্লাহ পাক আমাদের রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখার একটি উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম কৃপা!

দ্বিতীয় আরেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয় আমাদের যকৃৎ। দেহের মধ্যে যেসব মেদী বস্তু আছে তা পরিপাকের জন্য একটি পানীয়ের প্রয়োজন। লবণ-সর্বস্ব তিক্ত হলুদ রংয়ের এই বস্তুর নাম পিত্তরস বা

বাইল। যকৃৎ পিত্তরস তৈরী করে পিত্তাশয়ে তা জমা করে রাখে। সেখান থেকে ছোট্ট আঁতে তা সরবরাহ করা হয়।

যকৃতের আরেক কাজ হলো ভিটামিন জমা করে রাখা। যকৃৎ রক্ত থেকে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে সংগ্রহ করে নেয় এবং তা জমা রাখে ভবিষ্যতের জন্য। দুই থেকে চার বৎসর পর্যন্ত সাপ্লাই নিশ্চিত রাখার জন্য আমাদের যকৃৎ ভিটামিন বি-১২ জমা করে রাখে। যকৃতের এই জমা রাখার কাজটি সত্যিই চিত্তাকর্ষক। দেহের জন্য জরুরী ভিটামিনের অভাব থেকে মুক্ত থাকার এই কৌশল! আল্লাহর কী অপরিসীম দয়া!

এখানেই শেষ নয়, আমাদের যকৃৎ আসলে একটি 'রসায়নিক কারখানা' বটে। রক্তের মধ্যে প্রাপ্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন এই যকৃৎ উৎপাদন করে। এর একটির নাম 'আলবিউমিন'। এই প্রোটিনটি রক্তের মধ্যে কেলসিয়াম ও অন্যান্য জরুরী বস্তু থাকার নিশ্চয়তা দান করে। এটা রক্ত থেকে দেহের টিস্যুতে পানি সরবরাহেও সাহায্য করে থাকে। লাল রক্তকোষ অক্সিজেন বহন করে। এই কোষকে হিমোগ্লবিন বলে। লিভার গ্লবিন নামক হিমোগ্লবিনের একটি উপাদান উৎপাদন করে। এছাড়া যকৃৎ আরো যেসব কেমিক্যাল উৎপাদনের কাজে জড়িত তাদের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন (রক্ত জমাট বাধার জন্য জরুরী) এবং কলেস্টোরল (কোষের পর্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু) এখানে উল্লেখযোগ্য। যকৃতের আরেক কাজ হলো রক্ত থেকে বিষাক্ত বস্তু বের করে নিয়ে আসা এবং এগুলোকে রসায়নিকভাবে বদলে দিয়ে পিত্তরস উৎপাদন করা। বিষাক্ত এসব বস্তুর মধ্যে নেশাযুক্ত মাদকদ্রব্য ও এ্যালকাহল এখানে উল্লেখযোগ্য।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দেহযন্ত্রের সর্ববৃহৎ যন্ত্র লিভার বা যকৃতের উপর আমরা অনেক বেশী জ্ঞানার্জন করলাম। সত্যিকার অর্থেই এই লিভার দেহের একটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র যাকে কেউ কেউ কেমিক্যাল ফেক্টরী বলেছেন। লিভারের ৫ শতাধিক কাজের মধ্যে উপরে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি মাত্র। মানবদেহকে আল্লাহ পাক খুব জটিলভাবে ডিজাইন করার পর একে সবদিক থেকে সংরক্ষণ রাখার উপায়-অবলম্বন হিসাবে মগজ, হার্ট, ফুসফুস, লিভার ইত্যাদি দেহযন্ত্র

তৈরী করেছেন। এগুলোর সমন্বয় ফাংশন হেতু আমার বেঁচে থাকি। এসব মূলত আমাদেরকে বাঁচানোর কৌশলের অংশবিশেষ। তাই আমরা আল্লাহর এই করুণার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও প্রাণভরে উচ্চারণ করছি তাঁর প্রশংসাবাণী- আলহামদুলিল্লাহ!

৫. দেহের কিছু বিশেষ কোষ

এ পর্যায়ে এসে আমরা দেহের অভ্যন্তরস্থ কিছু বিশেষ কোষ (বা সেল) ও তাদের কার্যাদির উপর আলোচনার দরকার মনে করছি। যে কয়েকটি কোষের উপর আমাদের তথ্যানুসন্ধান সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের অত্যাশ্চর্য কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হলে আমরা বুঝতে পারবো কী অপূর্ব কৌশলে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের দেহকে গড়ে দিয়েছেন। প্রথমেই কোষ বলতে কি বুঝায় তার উপর কিছুটা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এটা জানার পর আমরা একে একে কয়েকটি বিশেষ 'টেইলর-মেইড' কোষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কোষকে জীবনের মৌলিক অংশ বলা চলে। আল্লাহ পাক এসব ক্ষুদ্র ইউনিটের মধ্যে এমন কিছু কার্যক্ষমতা দিয়েছেন যা চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। প্রত্যেকটি কোষ মূলত জীবন্ত প্রাণী বললেও অত্যুক্তি হবে না। আসলে এক-কোষবিশিষ্ট অনেক প্রাণীও আছে- এদেরকে বলে ইউনিসেল্যুলার প্রাণী। দৃষ্টান্ত হলো, জীবাণু। প্রত্যেক কোষ মৌলিক 'জীবনমূলক' কার্যাদি যেমন জৈবিক পদার্থ গ্রহণ, বর্জ্য নির্গতকরণ এবং পুনর্জনন ইত্যাদি করতে সক্ষম। জগতের সকল প্রাণী কোষের দ্বারা সৃষ্ট। একেকটি কোষ এক বা একাধিক বিশেষ কিছু কাজ আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। আর সার্বিকভাবে কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে মানবদেহের একেকটি অংশ যেমন হাত, পা, মস্তিষ্ক, পেশী, হাড্ডি, চামড়া, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃৎ, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, বিভিন্ন গ্রন্থি ইত্যাদি সবকিছু। আমরা এ প্রসঙ্গে লাল ও সাদা রক্তকোষ, প্লেটলেট, স্নায়ুকোষ এবং স্টেম কোষ- এই পাঁচটি বিশেষ দেহকোষ নিয়ে আলোচনা করবো।

ক. লাল রক্তকোষ

আমাদের রক্তের প্রায় ৪৫% লাল রক্তকোষ দ্বারা সৃষ্ট। এই কোষটি আল্লাহ পাক সত্যিকার অর্থে স্পেশালভাবে তৈরী করেছেন। এটিই ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ ও তা দেহের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। কিভাবে সে এই কাজটি আঞ্জাম দেয় তা এখনই আমরা জেনে নেবো। লাল রক্তকোষ মূলত প্রোটিন ও লৌহ মিশ্রিত একটি যুক্ত পদার্থের তৈরী। একে বলে হিমোগ্লোবিন।

হিমোগ্লোবিন

রক্তের লাল রং এই পদার্থের কারণেই হয়। এটার তিনটি বিশেষ গুণ আছে: অক্সিজেন, কার্বন ডাইওক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড এটা বহন করতে জানে। ফুসফুসে রক্ত এসে প্রথমে দেহের কোষ থেকে সংগ্রহিত বর্জ্য গ্যাস কার্বন ডাইওক্সাইড নিঃসৃত করে এবং শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশকৃত অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা তা 'অক্সিজিনেটেড' হয়। অর্থাৎ রক্তের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাসের মাত্রা বাড়ে। হিমোগ্লোবিন যখন এই অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে তখন একে 'অক্সিহিমোগ্লোবিন' বলে। এই অক্সিজেনযুক্ত হিমোগ্লোবিন দেহের কোষে কোষে যেয়ে তা সাপ্লাই দেয়। তবে ফিরে আসার আগে সে কোষের বর্জ্য কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। ফুসফুসে পুনরায় এই 'কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন' ফিরে এসে তা রিলিজ করে ও অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে আবার কোষে কোষে ফিরে যায়। এভাবে সে অবিরাম কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি লাল রক্তকোষের মূল উপাদান হিমোগ্লোবিন মূলত 'কুলিগিরির' কাজে নিয়োজিত আছে। ফুসফুসে একটি পদার্থ কোষ থেকে বহন করে নিয়ে আসা এবং ফেলে দেওয়া এরপর আরেকটি পদার্থ ফুসফুস থেকে সংগ্রহ ও বহন করে কোষে কোষে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। তবে হিমোগ্লোবিন নামক এই কুলির কাজ আরো আছে। গত শতাব্দির শেষের দিকে (১৯৯৬ সালে) বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, এই হিমোগ্লোবিন আমাদের দেহের

মধ্যে রক্তচাপকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি গ্যাস বহন করে থাকে যার নাম নাইট্রিক অক্সাইড। এই গ্যাসই দেহের শিরা-উপশিরার দেওয়ালকে শিথিল করে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

লাল রক্তকোষের মূল উপাদানের উপর কিছু তথ্য উপরে বর্ণিত হয়েছে। রক্তের এই কোষটির জীবন ১০০ থেকে ১২০ দিন মাত্র। অথচ এই কোষ ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার উপায় নেই। সুতরাং আল্লাহ পাক দেহের ভেতরই এটি উৎপাদনের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর এই উৎপাদনস্থল হলো আমাদের হাড্ডির মজ্জা।

হাড্ডির মজ্জা আসলে রক্তের সকল কোষ তথা লাল ও সাদা রক্তকোষ এবং প্লেটলেট উৎপাদন করে। আমরা একটু পরই সাদা রক্তকোষ ও প্লেটলেটের উপর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরবো। হাড্ডির মজ্জায় একটি বিশেষ ধরনের কোষ আছে- একে বলে হিমাটোপয়েটিক স্টেম সেল। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ফেক্টর ও হর্মোন দ্বারা এটি সক্রিয় করা হয়- ফলে এটা বিভক্ত হয়ে তৈরী করে অপরিপক্ক কোষ যাদের নামকরণ করা হয়েছে প্রজেনিটর রক্তকোষ। এগুলো পরে বিভক্ত হয়ে লাল কিংবা সাদা রক্তকোষ তৈরী করে। এছাড়া অপর একদল প্রজেনিটর কোষ প্লেটলেট কোষ তৈরী করে। নতুনভাবে সৃষ্ট এসব কোষ রক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহের সর্বত্র চলে যায়।

খ. সাদা রক্তকোষ

আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেহের মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে এই তন্ত্রের উপর বেশ কিছু তথ্যাদি তুলে ধরেছি। রক্তের মধ্যে এই সিস্টেমের 'সৈন্য-সামন্ত' হিসাবে একদল কোষ বানানো হয়েছে। এদের কাজ হলো রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্দেশ মুতাবিক যুদ্ধক্ষেত্রে যেয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া! এসব যুদ্ধোন্মাদ সৈন্যদের নাম হলো লিমফোসাইট্স। আমরা এদেরকে সাদা রক্তকোষ হিসাবেই সম্বোধন করবো।

উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সকল রক্তকোষের জন্মস্থান হলো হাড্ডির মজ্জা। সাদা রক্তকোষ মজ্জার বিভিন্ন স্থানে বেড়ে ওঠে। এদের কিছু মূল মজ্জায় পূর্ণতা লাভ করে আর এদেরকে বলে বি লিমফোসাইট। আমরা এদেরকে ব-সাদাকোষ বলবো। এদের কাজ হলো 'এ্যান্টিবডি' নামক বিশেষ উপাদান তৈরী করা। এরা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র বিচরণ করে এবং বিদেশী কোন বস্তুর সন্ধান পেলেই ওদেরকে জড়িয়ে ধরে ধ্বংস করে দেয়। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম কৃপা! কী সুকৌশলে তিনি আমাদের দেহের হিফাজত করে যাচ্ছেন।

আরেক ধরনের সাদা রক্তকোষ আছে। এদেরকে বলে টি লিমফোসাইট। আমরা এদেরকে ট-সাদাকোষ বলতে পারি। হাড্ডির মজ্জায় এসব কোষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না- তাই এদেরকে পরিপক্ক করার জন্য আল্লাহ পাক একটি বিশেষ গ্রন্থি (ছোট্ট দেহযন্ত্র) তৈরী করেছেন। এই গ্রন্থির নাম থাইমাস এবং এর অবস্থান আমাদের বুকের হাড্ডির পেছনে। ট-সাদাকোষের মধ্যে একটি বিশেষ জাতের কোষ আছে যাকে 'কিলার ট-সাদাকোষ' বলা যায়। এর কাজ হলো কোন দুশমন কোষকে সরাসরি হত্যা করা। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব ডিফেন্স সিস্টেম!

গ. প্লেটলেট

জীবনচলার ক্ষেত্রে আমরা কেউই ছোট-বড়ো দুর্ঘটনার কবলমুক্ত নই। তবে আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় কোন বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া সাধারণত আমাদের অধিকাংশই মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হই না। কিন্তু কেউ কোনদিন দুর্ঘটনা হেতু হাত কিংবা পা কাটেন নি- অথবা শরীরের কোথাও কাটাবিদ্ধ হয় নি, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না- কারণ, এসব ব্যাপার স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন কারণে চামড়া কেটে গেলে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে- সুতরাং এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি? রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়া যদি শীঘ্র বন্ধের ব্যবস্থা না হয় তাহলে আমরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবো এমনকি অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয়ের ফলে মারাত্মক

আকারে দেহের মধ্যে রক্তশূন্যতা বিরাজ করতে পারে, এবং এ থেকে মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। চামড়া কেটে গেলে রক্ত ঝরার কারণ হলো ক্ষুদ্রকায় উপশিরা বা ক্যাপিলারী যা আমাদের সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব ক্যাপিলারীর মাধ্যমেই হৃদযন্ত্র থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রতিটি কোষে কোষে পৌঁছে এবং কার্বন ডাইওক্সাইডযুক্ত রক্ত কোষ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। দুর্ঘটনা হেতু এসব উপশিরা কেটে গেলে দ্রুত রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে যায়- যা আদৌ কাম্য নয়। আল্লাহ পাক দেহের মধ্যে একটি সিস্টেম রেখেছেন যাতে এভাবে রক্ত ঝরে মারাত্মক ক্ষতি না হয়। সুবহানাল্লাহ! তিনি রক্তের মধ্যে একদল অতি ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এদের একমাত্র কাজ হলো ঐ ক্ষতস্থানে যেয়ে জমাট বেধে রক্ত ঝরা বন্ধ করে দেওয়া। এই কোষগুলোর নামই হলো প্লেটলেট। আমরা এদেরকে বাংলায় জমাটকোষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

এই স্বয়ংক্রিয় 'সেলাই' সিস্টেম না থাকলে বেঁচে থাকা মুশকিল হতো। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে আড়াই লক্ষ জমাটকোষ বিদ্যমান। এগুলো এমনিতেই রক্তের সঙ্গে সমগ্র দেহব্যাপী ঘুরাফেরা করে। কিন্তু যেই মুহূর্তে কোথাও কোন কেটে যাওয়া শিরা-উপশিরার সন্ধান পাবে তখন সাথে সাথে জমাটকোষ একত্রিত হয়ে ক্ষতস্থানে জমাট বাধা শুরু করবে। শুধু তাই নয়, এই ক্ষতস্থানকে পরিপূর্ণরূপে মেরামতের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে এসব কোষ ফাইব্রজেন নামক একটি রসায়নিক বস্তু তৈরী করে যার কাজ হলো সেলাই ক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। রক্ত জমাট বাধার কাজটি কেটে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শুরু হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! দেহকে ক্ষুদ্র পর্যায়ের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার কী অপূর্ব কৌশল! তবে বড়ো দুর্ঘটনায় পতিত হলে শুধুমাত্র রক্তে জমাটবাধা যথেষ্ট নয়- সে ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সাহায্য নেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। আর আল্লাহ পাক মানুষকে ডাক্তারী জ্ঞান দান করেছেন, ফলে আমরা প্রয়োজনে দেহের বিভিন্ন ছোটবড় সমস্যার সমাধান পেয়ে থাকি।

ঘ. স্নায়ুকোষ

আমাদের হেদের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ও রসায়নিক সিগনাল আদান-প্রদান হচ্ছে। সমগ্র দেহযন্ত্র একটি সক্রিয় জ্যান্ত ইউনিট হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে এসব সিগনাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ পাক আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখতে একটি বিশেষ কোষ সৃষ্টি করেছেন যার কাজ হলো এসব সিগনাল ক্যারী বা বহন করা। বিশেষভাবে ডিজাইনকৃত এসব কোষকে বলে নিউরন বা স্নায়ুকোষ। আমাদের মগজের মধ্যে এরূপ অসংখ্য নিউরন আছে- মূলত দু' ধরনের কোষের মাধ্যমেই পুরো মস্তিষ্ক সৃষ্টঃ অপর কোষের নাম নিউরোগ্লিয়া। দ্বিতীয় এই কোষের কাজ হলো নিউরনকে কাঠামোগত সমর্থন প্রদান করা। আমরা এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র প্রথম প্রকার স্নায়ুকোষ তথা নিউরনের উপর আলোচনা সীমিত রাখবো।

আগের অধ্যায়ে আমরা 'স্নায়ুতন্ত্রের' উপর আলোচনা কলে নিউরন সম্পর্কে বলেছি। কেন্দ্রীয় ও বাইর স্নায়ুতন্ত্র মূলত স্নায়ুকোষ দ্বারাই পরিচালিত হয়। দেহের এক স্থান থেকে অপর স্থানে (মৌলিকভাবে মগজ ও দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষার্থে) এসব কোষ সত্যিই চিত্তাকর্ষক উপায়ে কাজ করে থাকে। এদের ডিজাইনও স্পেশাল। নিউরনরা আসলে স্বস্থান থেকে সরে না- অর্থাৎ সিগনাল বহন করার মানে এই নয় যে, তারা তথ্য নিয়ে এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাতায়াত করে। বরং এগুলোকে আল্লাহ্ পাক তথ্য বহনের মাধ্যমে বানিয়েছেন একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত রেখে। একপ্রান্তে তথ্য আসে এবং অপরপ্রান্ত দিয়ে তা নিকটবর্তী কোষে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে তথ্য উৎপাদন স্থল থেকে তা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত ভ্রমণ করে। সাধারণত অধিকাংশ তথ্য (যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি) মগজ পর্যন্ত ভ্রমণ করে। মগজ তা সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন মনে করুন, কোন কারণে আপনার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ব্যথা লাগলো। ঠিক যে স্থানে ব্যথা লেগেছে সেখানকার নিউরন বা স্নায়ুকোষে সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক-রসায়নিক সিগনালের জন্ম হবে। এই সিগনাল অতি

দ্রুত অন্যান্য পাশাপাশি স্নায়ুকোষের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কে যেয়ে পৌঁছবে। মস্তিষ্কের ব্যথা অনুভব করার স্নায়ুগুলো এই সিগনালকে সনাক্ত করে চেতনার মধ্যে 'ব্যথা' জাগ্রত করে দেবে- ফলে ব্যথা অনুভব হবে। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে তথ্য সৃষ্টি, বহন ও প্রতিক্রিয়া এই তিনটি কাজ নিউরনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। শুধু যে তথ্য মগজের বাইরে সৃষ্টি হয় তা কিন্তু নয়, স্বয়ং মগজের মধ্যেও তথ্য সৃষ্টি হয়ে নিউরনের মাধ্যমে তা দেহের বিভিন্ন অংশে যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

মনে করুন আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার ডান পা একটু উপরের দিকে উঠাতে চান। আপনার ইচ্ছাটি প্রথমে মগজে সৃষ্টি হবে। মগজ তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সিগনাল নিউরনের মাধ্যমে পায়ের পেশী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সিগনাল পেয়ে পেশীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে এবং এর ফলাফল দাঁড়াবে- পা ওঠানো। এভাবে দেহের যাবতীয় নড়াচড়া নিশ্চিত হয়। মগজ ও পেশীর মধ্যে নিউরনের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে অসংখ্য বৈদ্যুতিক ও রসায়নিক সিগনাল আদান-প্রদান হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম কুদরত! মানবদেহ মূলত তাঁর কুদরতের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত যার উপর গবেষণা করলে সত্যিই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

ঙ. স্টেম কোষ

বিশেষ কোষের উপর আলোচনায় সবশেষে আমরা একটি কোষের উপর কিছু তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছে করছি যা সকল কোষের মূল। দেহের প্রতিটি অংশ এই কোষ থেকে তৈরী হয়। স্টেম কোষ নিজেদেরকে নকল করতে জানে এবং যে কোন দেহাংশের বিশেষ কোষ তৈরী করতেও পারে। আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলের একটি অপূর্ব দিক হলো এসব স্টেম কোষ। একটিমাত্র কোষ থেকে আমাদের পুরো দেহের বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি এবং পরিচালনা মূলত এই স্টেম কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা জানি সকল কোষই নিজেদেরকে বিভক্ত করে নতুন কপি তৈরী করতে জানে। কোষের মধ্যে এই গুণটি একান্ত জরুরীও। দেহের প্রায় সকল কোষ অনেক কারণে ক্ষয় হয়ে থাকে- অবিকল নতুন কোষ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষ প্রতিস্থাপন না হলে উপায় নেই। এছাড়া প্রয়োজনে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত কোষদেরকে পুনরায় প্রাণবন্ত তথা কর্মক্ষম করে তোলারও ব্যবস্থা থাকা চাই। আল্লাহ পাক প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে ডিএনএ নামক মলিকিউল রেখেছেন। এটির মধ্যে নতুন কোষ সৃষ্টির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ থাকে। ডিএনএ ও আরএনএ নামক বিশেষ মলিকিউল নিয়ে একটু পরই আমরা আলোচনা করবো। এখানে স্টেম কোষের মধ্যে যে সাধারণ কোষের তুলনায় একটি অতিরিক্ত গুণ আছে তা-ই বুঝানোর চেষ্টা করছি। বিভক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে হুবহু নকল করার গুণটি ছাড়াও স্টেম কোষ অন্য ধরনের কোষ 'তৈরী' করতে জানে। আর এটাই হলো এই কোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ নিয়ে আলোচনায় উল্লেখ করেছি, এই স্টেম কোষ থেকেই হাড্ডির মজ্জায় সাদা, লাল ও প্লেটলেট রক্তকোষ তৈরী হয়। স্টেম কোষ সত্যিই এক অপূর্ব ডিজাইন ও কৌশলে সৃষ্ট একটি কোষ। এখানে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের আরো একটি অত্যাশ্চর্য দিক আমাদের নিকট উন্মোচন হয়েছে বিজ্ঞানের সুবাদে। দেহের বিভিন্ন কোষ যেমন হাড্ডি, রক্ত, পেশী, চামড়া এবং অন্যান্য বিশেষ কোষ যাদের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও দেহযন্ত্র। সুবহানাল্লাহ! আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার তাঁর কী অপূর্ব কৌশল!

প্রজনন থেকে প্রজননে তথ্য সংরক্ষণের কৌশল

আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি ছেলের চেহারা অনেকটা পিতা, মাতা, ভাই কিংবা পরিবারের অন্য কারোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বা এমনকি একই ধরনের। দু'জন আইডেন্টিক্যাল জমজ ভাই বা বোন একে অন্যের নকল বলে মনে হয়। এরূপ হওয়ার কারণ কি? প্রথমোক্ত সামঞ্জস্যে সামান্যতম হলেও পার্থক্য থাকে। দ্বিতীয়টিতে তা-ও নেই। বিজ্ঞানীরা এরূপ হওয়ার

কারণ সনাক্ত করেছেন। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে একটি জটিলভাবে তৈরীকৃত এসিড (মূলত মলিকিউল) আছে যার নামকরণ হয়েছে 'ডিওক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড' সংক্ষেপে ডিএনএ। এই ডিএনএ মলিকিউলে যাবতীয় জেনেটিক তথ্য সংরক্ষিত থাকে। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বস্তুটি হলো এই ডিএনএ- এটাই কোষ বিভক্তি ও প্রোটিন সৃষ্টির ক্রিয়ার জন্য দায়ী। প্রতিটি কোষ বা জীবাণুর ক্রিয়া-কলাপ ও বৃদ্ধি নিশ্চিত হয় প্রোটিন সৃষ্টির মাধ্যমে। আর কোষ বিভক্তি নকলকরণ ছাড়া দেহের বিভিন্ন অংশ তৈরী সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক কোষের ডিএনএ পরবর্তী প্রজন্মের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সৃষ্টির সূচনা করে। এ পর্যায়ে আমরা ডিএনএ-এর উপর আর অতিরিক্ত কিছু না বলাই উত্তম। একটু পরই এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো- এতে পাঠকদের মাঝে আল্লাহর সৃষ্টির অপূর্ব কুদরত উন্মোচন হবে বলে আশা রাখি। পাঠকরা জানতে পারবেন কিভাবে এই ক্ষুদ্রকায় একটি মলিকিউলে মহান প্রভু মানবদেহের যাবতীয় সৃষ্টিরহস্য লুকিয়ে রেখেছেন। এসব জানার পর অবশ্যই আপনাকে সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভূত হবে বলে মনে করি। আর এখানেই শেষ নয়- ডিএনএ এর অনুরূপ আরেকটি অত্যাশ্চর্য ডিজাইনের মলিকিউল আল্লাহ পাক তৈরী করেছেন।

দ্বিতীয় এই মলিকিউলের নাম 'রাইবোনিউক্লিক এসিড' সংক্ষেপে আরএনএ। উল্লেখ্য 'মলিকিউল' হলো একাধিক একই বা ভিন্ন ধরনের এটমের সৃষ্ট বস্তুর একেকটি ক্ষুদ্র অংশ। এগুলো বিশেষ উপায়ে অবস্থান নিয়ে 'বন্ড' বা যুক্ত হয়ে থাকে। কোনটির মধ্যে কোন জাতের এটম ও কিভাবে তা বন্ড করা আছে তার উপর নির্ভর করে এর গুণাবলী। যেমন পানির মলিকিউল তৈরী হয়েছে দু'টি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটমের বন্ডের মাধ্যমে। ডিএনএ ও আরএনএ এরূপ 'বন্ডকৃত' মলিকিউল। বিশেষভাবে বন্ড হওয়ার দরুন এদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে কিছু বিশেষ গুণাবলী। সুতরাং বলা যায় সকল বস্তুকে এভাবে তৈরী করে আল্লাহ পাক এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রদান করেছেন। সুবহানাল্লাহ! অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ

পাক এভাবে সবকিছুকে তাঁর ক্ষমতাবলে সুকৌশলে 'ডিজাইন' করেছেন। এগুলো এমনিতেই সৃষ্ট হয়ে গেছে- এরূপ উদ্ভট বিশ্বাস রাখে শুধুমাত্র ওসব চরম বস্তুবাদী 'বিজ্ঞানী' ও শিক্ষিতরা যাদের অন্তর 'ঈমানের' নূর দ্বারা আলোকোজ্জ্বল হয় নি। আমরা বিজ্ঞানের উপর লেখাপড়া করেও এটা নিশ্চিত জানতে পেরেছি যে, বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বিবর্তনের মাধ্যমে ডিএনএ ও আরএনএ এবং সবশেষে যাবতীয় বস্তুজগৎ কখনো আত্মপ্রকাশ করতে পারে না- এটা বিজ্ঞান দ্বারাই প্রমাণিত। বিজ্ঞান বলেছে, এভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে ডিএনএ আত্মপ্রকাশ করার চান্স বা সম্ভাবনা প্রায় শূন্য! যা হোক স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এটা সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, মানবদেহ যেভাবে সুকৌশলে সৃষ্টি হয়েছে তা কোন ক্রমেই 'এমনিতে' হয় নি।

নাস্তিক-বেঈমানদের 'যুক্তির' নামে কূটকৌশলী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক (মূলত ধারণাভিত্তিক থিওরী) বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছড়িয়ে মানুষের ঈমান নষ্টের অপচেষ্টা হচ্ছে আধুনিক এই বিশ্বে। এদের চাকচিক্যপূর্ণ ব্যাখ্যা যে মূলত ভিত্তিহীন তা আজ ধীরে ধীরে সেই বিজ্ঞান দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। এরপরও আমরা এদের কুফরী প্রচারণা থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর দরবারে ফানাহ্‌ চাই। আমরা অবশ্য কোন বিজ্ঞানের সত্য জেনে কিংবা যুক্তির নিরিখে ঈমান আনি নি- আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঈমান-আমল শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন দ্বীন ইসলাম; প্রমাণ স্বরূপ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহাপুরুষের বাণীই ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আমাদের নিকট যথেষ্ট। আমরা তাঁর পবিত্র মুখের কথা (ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া তথা হক্ব উলামার মাধ্যমে) শোনেছি ও বিশ্বাস করেছি। কারণ, আমরা জানি ঈমান-বিল-গায়িব যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করে না- এটার জন্য স্বয়ং মহান আল্লাহর একান্ত দয়া ও ইচ্ছার প্রয়োজন। মাধ্যম হিসাবে তিনি যুগ-যুগ ধরে নবী-রাসূলদেরকে (আঃ) পাঠিয়ে মানুষকে হিদায়াতের রাস্তা দেখিয়েছেন। সুতরাং পাঠকরা এটা মনে করবেন না যে, অত্র গ্রন্থ দ্বারা আমি যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছি। তা মোটেই নয়- বরং আমাদের সর্বাপেক্ষা কাছের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি 'মানবদেহে'

আল্লাহর কুদরতের বিকাশ বিজ্ঞান দ্বারা কিভাবে উন্মোচন হয়েছে তা প্রকাশ করার প্রয়াস চালাচ্ছি। আশা করা যায় এ থেকে আমরা মহান প্রভুর আনুগত্য তথা ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি আরো বেশী আকর্ষণ বোধ করবো।

আল্লাহর সৃষ্ট সকল বস্তুর উপর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান দ্বারা যে ঈমানী শক্তি আরো দৃঢ়তর হতে পারে তার ইঙ্গিত স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে একাধিক স্থানে করেছেন। আর মানবদেহের কোষের কেন্দ্রে যে অত্যাশ্চর্য একটি মলিকিউল তিনি তৈরী করেছেন সে সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান যা জানতে পেরেছে তার বর্ণনা সত্যিই অত্যাশ্চর্য, চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর এক কাহিনী।

ডিএনএ

আপনি যদি একটি মইকে মুচড়ে দিন তাহলে যে আকার ধারণ করবে ঠিক সেরূপ আকারেই ডিওক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ মলিকিউল সৃষ্ট। এতে আছে দু'দিকে দু'টি চেইন বা স্ট্রান্ড। আমরা এগুলোকে মইয়ের বা মুচড়ানো সিঁড়ির দু'দিকের দীর্ঘ দু'টি খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি যার মধ্যে সিঁড়িগুলো যুক্ত থাকে। উভয় চেইন বহুসংখ্যক রসায়নিক যুক্ত-পদার্থের তৈরী। এদেরকে বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন, নিউক্লিওটাইড। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড আবার তিনটি ভিন্ন অংশে বিভক্ত। এগুলো হলো: ১. একটি চিনির মলিকিউল যার নাম ডিওক্সিরাইবোজ, ২. একটি ফসফেট গ্রুপের রসায়ন এবং ৩. চারটি ভিন্ন নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থের একটি যাদেরকে বলে বেইজ। এই বেইজগুলো হলো: এডেনিন (এ), গুয়ানিন (গ), থাইমিন (থ) এবং সাইটোসিন (স)। আপাতত এসব নামের প্রতি তেমন গুরুত্বের প্রয়োজন নেই। আমাদের উদ্দেশ্য ডিএনএ মলিকিউলের কাঠামো, তার ডিজাইন ও কার্যকারিতা বর্ণনা।

ডিওক্সিরাইবোজ মলিকিউল নিউক্লিওটাইডের কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকে। এর একদিকে আছে ফসফেইট গ্রুপের একটি আর অপরদিকে উপরোক্ত বেইজের যে কোন একটি। ডিওক্সিরাইবোজের নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে প্রতিটি চেইনের পরবর্তী অংশের নিউক্লিওটাইডও যুক্ত আছে- আর এভাবেই ডিওক্সিরাইবোজ-ফসফেইট উপ-অংশগুলো মিলে তৈরী করেছে সিঁড়ির দু'দিকের দু'টি চেইন বা স্ট্রান্ড। একটি স্ট্রান্ডের নিউক্লিওটাইডের সাথে অপর স্ট্রান্ডের নিউক্লিওটাইডের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। যে নিউক্লিওটাইডে এডেনিন আছে তা সর্বদাই অপর নিউক্লিওটাইডের থাইনিন এর সঙ্গে জোড়া তৈরী করে। অপরদিকে যেটিতে আছে সাইটোসিস তা সর্বদাই অপর নিউক্লিওটাইডের গুয়ানিন এর সঙ্গে জোড়ায় মিলিত হয়। এসব বেইজ একে অন্যের সঙ্গে একটি দুর্বল রসায়নিক বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এই বন্ডের নাম হাইড্রোজেন বন্ড। ডিএনএ মলিকিউল কোষের কেন্দ্রস্থলে ক্রমোজাম নামক একটি ইউনিটে অবস্থান করে।

উপরের বর্ণনা হয়তো পাঠকদের নিকট বুঝার ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্টকর হতে পারে। তবে ভাবনার প্রয়োজন নেই- আমরা ডিএনএ নামক কোষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই মলিকিউলটির সৃষ্টি কাঠামো তুলে ধরেছি মাত্র। লেখার সঙ্গে যুক্ত যে দু'টি ছবি দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালো করে স্ট্যাডি করে নিলেই ব্যাপারটি সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। কি অপূর্ব কৌশলে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ পাক এই মলিকিউলটি তৈরী করেছেন তা-ই অনুধাবন এখানে মুখ্য বিষয়। এই মলিকিউল কিভাবে কাজ করে সে বর্ণনা থেকেই আমরা বেশী উপকৃত হবো। তবে টেকনিক্যাল কোন তথ্যাদির গভীরে যাওয়া আমাদের জন্য কাম্য কিংবা প্রয়োজন নেই।

ডিএনএ মলিকিউলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রোটিন নামক উপাদান তৈরী করা। সুতরাং আসুন, প্রথমে এই প্রোটিন জিনিসটি কি তা একটু তলিয়ে দেখি।

প্রোটিন

যে কোন প্রাণীকে বেঁচে থাকার মৌলিক একটি উপাদান হলো প্রোটিন নামক বড়ো আয়তনের রসায়নিক পদার্থ। প্রতিটি কোষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো এই প্রোটিন। একটি কোষের মোট ওজনের অর্ধেকটাই এই প্রোটিনের মধ্যে বিদ্যমান। গ্রীক শব্দ 'প্রোটিওস' থেকে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ 'প্রাথমিক'।

মানবদেহে অন্তত ৩০,০০০ ভিন্ন প্রোটিন আছে। এই বিরাট সংখ্যক প্রোটিনের মধ্যে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত মাত্র ২ শতাংশ সম্পর্কে পুরো জ্ঞানার্জন করেছে। প্রোটিন দ্বারা কোষ সৃষ্টি ও এনার্জি তৈরী হয়। এছাড়া এদের কারণেই আমরা পেশীকে সংকোচন করতে সক্ষম হই। দেহের পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাহায্যকারী মলিকিউল 'এনজাইম' মূলত প্রোটিন। অনুরূপভাবে চিনি নিয়ন্ত্রক উপাদান ইনস্যুলিন ও অধিকাংশ হর্মোন হলো প্রোটিন মলিকিউল। এছাড়া রক্তের এ্যান্টিবডি, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদিও প্রোটিন জাতীয় মলিকিউল।

ডিএনএ মলিকিউল কোষের মধ্যে এই প্রোটিন উৎপাদন ক্রিয়া শুরু করে। ডিএনএ এর মধ্যে সংরক্ষিত প্রজনন তথ্য থেকে এই উৎপাদন কার্য আরম্ভ হয়। এ প্রসঙ্গে ঠিক কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সাধিত হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা তুলে ধরতে অপারগ- যা মূলত খুব জটিল ও টেকনিক্যাল ব্যাপার। তবে এটুকু বলা যায় যে, ডিএনএ প্রথমে এমআরএনএ (মেসেঞ্জার রিবোনিউক্লিক এসিড) নামক একটি তথ্য বহনকারী মলিকিউল তৈরী করে। এটা কেন্দ্রের বাইরে এসে কোষের মধ্যে ভাসমান রিবোজাম নামক অংশে এসে যুক্ত হয়। এই রিবোজামই হলো প্রোটিন সৃষ্টির কারখানা। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে মহান কৌশলী আল্লাহ পাক ডিএনএ নামক মলিকিউল তৈরী করে এর মধ্যে সকল জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণ করেছেন প্রোটিন সৃষ্টির জন্য। তবে ডিএনএ মলিকিউলের কাজ আরো আছে।

ডিএনএ মলিকিউলের গুরুত্বপূর্ণ আরেক কাজ হলা হুবহু বিভক্তি ক্রিয়া। কোষের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা এর বিভক্তি ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সে নিজেকে হুবহু কপি করতে হবে। এই কাজটির শুরু হয় কোষের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বা ব্রেন ডিএনএ মলিকিউলে। কারণ ডিএনএ নিজেই যদি নিজেকে হুবহু নকল না করে তাহলে একটি কোষ থেকে দু'টি হওয়া সম্ভব নয়। কোষ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ডিএনএ নিজেকে কপি করার কাজটি সেরে নেয়। সুবহানাল্লাহ! কোন্ শক্তিটি ডিএনএ-কে এভাবে বিভক্ত হওয়ার জন্য সক্রিয় করে তোলে? বিজ্ঞান এই প্রশ্নের জবাব জানে না- তবে আমরা জানি! মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কুদরতে ডিএনএ এর মধ্যে এই প্রেরণার জন্ম নেয়। তিনিই মূলক যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, বিবর্তক, পরিবর্ধক এবং পরিচালক। মানবদেহের ভেতর অসংখ্য কার্যাদি প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে- কিন্তু কোন কারণে তা হচ্ছে কেউ জানে না- তবে তা ঘটা কিন্তু দেহকে জ্যান্ত ও কর্মক্ষম রাখার জন্য অবশ্যকরণীয়। কিভাবে ঘটছে তা আজকের বিজ্ঞান দ্বারা আমরা কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি মাত্র- কিন্তু যেভাবে এসব ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হচ্ছে ঠিক সেভাবে কেনো হচ্ছে এর জবাব আমরা জানি না বা জানতে পারবো না। এসব মূলত আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলের নিদর্শন মাত্র- তিনি যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে মানবদেহের যাবতীয় কার্য-কলাপ সংগঠিত হচ্ছে এবং এভাবেই আমরা জ্যান্ত আছি। সুবহানাল্লাহ!

আরএনএ

এই মলিকিউলটি আসলে ডিএনএ মলিকিউলের সাহায্যকারী একটি উপাদান। প্রোটিন উৎপাদনে এটি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। কোষের মধ্যে তিন ধরনের আরএনএ (বা রাইবোনিউক্লিক এসিড) আছে। প্রথমটি হলো রাইরোসোমাল আরএনএ। এটির অবস্থান হলো কোষের রিবোজাম নামক অংশে। এখানেই প্রোটিন উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়টির অবস্থান কোষের সাইটোপ্লাজম তথা কেন্দ্রের বাইরে। এটাকে বলে ট্রান্সফার আরএনএ। এই মলিকিউলের কাজ হলো প্রোটিনে যুক্ত করার

লক্ষ্যে 'আমিনো এসিড' নামক মলিকিউলকে রিবোজামে নিয়ে যাওয়া বা ট্রান্সফার করা। তৃতীয় ধরনের আরএনএ ডিএনএ থেকে জেনেটিক ব্লু-প্রিন্ট রিবোজামে নিয়ে পৌঁছায়- একে বলে মেসেঞ্জার আরএনএ। এই তিনটি আরএনএ প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রোটিন উৎপাদন নিশ্চিত করতে যেয়ে ডিএনএ মলিকিউলকে এই তিনটি আরএনএ মলিকিউল মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপূর্ব সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা!

তৃতীয় অধ্যায়

মানবদেহের মৃত্যু

আলহমাদুলিল্লাহ! প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেহতত্বের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছি। আমরা আমাদের দেহসৃষ্টির অপূর্ব পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ক্রিয়া-কলাপের উপর বেশ গভীরে বিচরণ করেছি। বিভিন্ন জৈবিক বস্তু দ্বারা কিভাবে আল্লাহ পাক দেহের সকল যন্ত্রাংশ তৈরী করেছেন ও এগুলো পালন তথা পরিচালনা ও সংরক্ষণ করছেন তা এখন আমাদের নিকট অনেকটা উন্মোচন হয়েছে।

বস্তুজগতের সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র মহান আল্লাহ পাক চিরঞ্জীবী। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ- এজন্য বলা হয়, মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত। এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও মরণশীল। মৃত্যুর পরিণতি থেকে কেউ রেহাই পাবেন না। আর এই মৃত্যু যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে। তবে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টিকৌশলের একটি অংশ হিসাবে যাবতীয় ঘটনার পেছনে এক বা একাধিক কারণ রেখে দিয়েছেন। এসব কারণ যদিও সর্বদা আমরা সনাক্ত করতে পারি না- তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভব। মানবদেহের মৃত্যুর কারণসমূহ এই অধ্যায়ে বিজ্ঞানের আলোকে বর্ণনা করবো। এ থেকে আমরা অবগত হবো যে, এতো জটিল ও সুকৌশলে সৃষ্ট এই দেহকে আল্লাহ পাক আদৌ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইহলোকে থাকার উদ্দেশ্যে বানিয়েছেন। ইহলোক অস্থায়ী- কিন্তু পরলোক চিরস্থায়ী। প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, এতো ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য অতি জটিল ও সু-কৌশলে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষের দেহকে কেনো তৈরী করা হলো? এর উত্তর হলো মানুষকে ইতরপ্রাণী থেকে আলাদা রেখে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যাতে তার মধ্যে প্রভু-পরিচিতি ও আনুগত্যের চেতনার বিকাশ ঘটে। এসব উচ্চপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞার ক্ষেত্র হতে হবে উপযুক্ত ও যথার্থ। আর সর্বোপরি এমন একটি দেহ চাই যার মধ্যে ঊর্ধ্ব জগতের আত্মা বা রূহ অবস্থান করার যোগ্যতা বিদ্যমান। বাস্তবে

সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাময়, প্রভুভক্ত ও আনুগত্যশীল একটি রূহকে দেহের মধ্যে কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ রাখার নিমিত্তেই এই এতো আয়োজন। রূহ দ্বারা মানুষ জ্যান্ত এবং এর অনুপস্থিতিতে সে মৃত। অন্যদিকে দেহ যদি মরে যায় তাহলে রূহ প্রস্থান করে আর রূহ প্রস্থান করলে দেহ নির্জীব তথা মৃত।

রূহ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা হবে। এ অধ্যায়ে গবেষণার ব্যাপ্তি মানবদেহের মৃত্যু কিভাবে ঘটে তার উপর সীমিত থাকবে। আর আশা করা যায় এ লেখাটুকু পাঠের পর আমরা নিজেদের মৃত্যুকে আর ভুলে যাবো না- অন্তত মৃত্যুচিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত রেখে ইহ-পরকালের অফুরন্ত উপকার হাসিল করার চেষ্টায় লেগে যাবো। আমরা আল্লাহর দরবারে এটাই কামনা করি।

"আজকাল অনেক লোক মারা যাচ্ছে বলে মনে হয়!" - বেশ কিছুদিন পূর্বে একজন বৃদ্ধা এই মন্তব্য করেছিলেন। অবশ্য বৃদ্ধার মনে এই প্রশ্ন ওঠার আসল কারণ হলো পৃথিবীর জনসংখ্যা। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সে হারে মৃত্যুও বাড়ার কথা। কিন্তু আসলে তাই নয়- একটি দম্পতি থেকে আল্লাহর ইচ্ছে হলে দশ-পনেরজন পর্যন্ত সন্তানের জন্ম হতে পারে। এই একই সময়ের ভেতর তার নিজের কিংবা আশেপাশের পরিবারভুক্ত লোকদের মৃত্যুর হার অনেক কম হয়ে থাকে। যে হারে মানুষ মারা যায় তার থেকে অনেকগুণ বেশী হারে মানুষ জন্ম নিতে পারে।

যা হোক, বৃদ্ধার উপরোক্ত মন্তব্য ও তৎপরবর্তী এই কথাগুলো অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলেই ধরা যায়- তাই আর অগ্রসর হচ্ছি না। এখানে এটা উল্লেখ করার কারণ হলো মৃত্যুকে মানুষ মেনে নিতে পারে না- বৃদ্ধার ঐ মন্তব্য থেকে কথাটি স্পষ্ট হয়েছে। আমরা কেউই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলতে পারবো না যে, আমি মরে যেতে চাই! আমরা সবাই বাঁচতে চাই। কিন্তু মরণ যে অনিবার্য সে চিন্তা থেকেও বাস্তবে আমরা কখনো মুক্ত নই। মনের গভীরে তা অবশ্যই উঁকিঝুঁকি দেয় সারাক্ষণ। তবে আমাদের জীবন ও এর জটিলতা এই চিন্তাকে ধাবিয়ে রেখেছে। তাছাড়া আমাদের

মনে এক অজানা শক্তি 'মৃত্যুচিন্তা' থেকে আমাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টায় আছে সর্বদাই। যা হোক, অনিবার্য এই মৃত্যু আসলে কী জিনিস? বিজ্ঞানের আলোকে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

মৃত্যুর অর্থ

অধিকাংশ অভিধানে মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "জীবনের অবসান" কিংবা "অস্তিত্বের বিলোপ"। কিন্তু 'জীবন' বা 'অস্তিত্ব' বলতে কী বুঝায়? বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা এ দু'টো শব্দের সংজ্ঞা বের করা সহজ নয়। তবে আমরা সেদিকে না যেয়ে শুধু বলতে পারি, দেহের যাবতীয় কার্যকারিতা যেই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তা পুনরায় শুরুর সম্ভাবনা পুরোধমে শেষ হবে তখনই মানুষ মারা গেছে বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের সমাপ্তি ও সেসাথে শ্বাস-নিঃশ্বাসের ইতিকে 'মৃত্যুর' সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বলা হয়ে থাকে। তবে ইদানিং আধুনিক মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের পাম্পিং একশন অব্যাহত রাখার উপায় বের হয়েছে। তবে এসব উপায় থাকলেও এক সময় আসে যখন আর কোন কিছুই কাজে লাগে না। মগজসহ দেহের প্রতিটি কোষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই পর্যায়ে অবনতি ঘটলেই ডাক্তাররা মনুষকে 'মৃত' বলে ঘোষণা দেন।

একবার এক আমেরিকান ডাক্তার বলেছিলেন, 'বাঁচার অর্থ হলো কর্মক্ষম থাকা এবং বাঁচার মধ্যে এটাই"। কিন্তু কে কিংবা কী জিনিস বাঁচে যা কর্মক্ষমের অধিকারী- সে কথার জবাব সহজ নয়। ঈমানী নূরে ব্যাপারটি বুঝা কিন্তু অনেকটা সহজ হয়ে যায়। বাঁচে যে জিনিস তাহলো আত্মা ও দেহ। আর মরে যে জিনিস তাহলো শুধুমাত্র দেহ কারণ সে আত্মা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। এই ইহলোকে এককভাবে উভয়টি জ্যান্ত থাকে না (তবে আত্মা জ্যান্ত- তা আমাদের চেতনায় এককভাবে আত্মপ্রকাশ করে না, এই যা) - কারণ আত্মাকে উপলব্ধির জন্য দেহের প্রয়োজন এবং দেহকে কর্মক্ষম তথা জ্যান্ত থাকতে আত্মার প্রয়োজন।

পাঠকরা এটুকু আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, মানুষের মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়।

মৃত্যু একটি ক্রিয়া

বাস্তবে মানবদেহের মৃত্যু একটি ক্রিয়ার নাম। আত্মার প্রস্থানের পরও দেহের কিছু কিছু কার্যাদি অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে মানুষকে পুনরায় জীবিত করার কোন পথ খোলা থাকে না। তবে ঠিক কোন অবস্থায় পতিত হওয়ার পর মানুষ 'মৃত' বলে নির্দ্বিধায় ঘোষণা দেওয়া যায়? মানুষের আত্মার প্রস্থান তো আমরা বুঝতে অক্ষম। বিজ্ঞান দ্বারা তো তা জানা কখনো সম্ভব নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া তথা স্পন্দন বন্ধ হওয়ার পরও হৃদযন্ত্রের অভ্যন্তরে কিছুটা কম্পন কয়েক মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিন ঘণ্টা পার হওয়ার পরও চোখের মণিতে একজাতীয় ঔষধ ঢেলে দিলে তা সংকোচ হয়ে যায়। বিভিন্ন দেহপেশীতে বারবার মৃদু আঘাত হানলে তা নড়েচড়ে ওঠতে পারে! একদিন পার হওয়ার পরও মৃতের চামড়া অন্যের চামড়ায় নিয়ে লাগানোর সম্ভাবনা থাকে। এই প্রসেসকে বলে স্কিন গ্রাফ্ট। হাড্ডি ৪৮ ঘণ্টা পরেও অন্যের কাজে লাগানো যায় এবং হৃদযন্ত্রের 'আরটারী' (শিরা) অন্য কারো হার্টে নিয়ে লাগানো সম্ভব মৃত্যুর ৭২ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও। এসব তথ্য থেকে এটাই বুঝা গেল যে, মানুষ মরে যাওয়ার পরও তার দেহের বিভিন্ন অংশ ফাংশন করে তথা জ্যান্ত থাকে। মানুষের কোষগুলো দীর্ঘ সময় অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত থেকেও 'জীবিত' থাকতে পারে। কিন্তু এই জ্যান্ত থাকার নাম পুরো মানুষ জ্যান্ত থাকা নয়। কারণ, মানুষ জীবিত থাকার অর্থ হলো চেতনশীল হওয়া তথা দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান।

আমরা জানি কৃত্রিম উপায়ে আজকাল মানবদেহের কোষগুলোকে 'মগজ' মরে যাওয়ার পরও কিছু সময় জ্যান্ত রাখা যায়। অর্থাৎ ব্রেন মরলেও দেহ জ্যান্ত থাকে। কিন্তু এভাবে দেহ জ্যান্ত থাকার নাম পুরো মানুষটি জ্যান্ত আছে তা কিন্তু নয়। মানুষের মগজই শরীরকে পরিচালনা করে। সুতরাং সে মারা গেলে শরীর জ্যান্ত থাকলেও সম্পূর্ণ অচল।

মানুষ মরে যাওয়ার পর আর জ্যান্ত করার কোন উপায় খোলা থাকে না। কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তকে 'মৃত্যু' বলা যায়? কোন্ ক্ষণটিতে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' ক্রিয়াটি আত্মপ্রকাশ করে? ক্লিনিক্যাল ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া যে মুহূর্তে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তখনই 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত চলাচলও আর অবশিষ্ট থাকবে না। কিছুক্ষণ পর্যন্ত হৃদযন্ত্রকে পুনরায় সক্রিয় করার চেষ্টা চালানোর পরও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তখনই বলা যায়, লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। আর দেহের মৃত্যুর অর্থ হলো সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও সকল দেহযন্ত্রসহ পুরো দেহ একটি ক্রিয়াশীল ইউনিট হিসাবে সম্পূর্ণ অকেজো। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার পর যথেষ্ট সময় পার হলেই ব্রেন স্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ মরে যায়। আর এই স্টেম মরে গেলেও আর জ্যান্ত করার উপায় থাকে না - যদিও হৃদযন্ত্রকে পুনরায় কর্মক্ষম করা সম্ভব হতে পারে। আর এ কারণেই মৃত ব্যক্তির হৃদযন্ত্র হার্ট ট্রান্সপ্লান্টে ব্যবহার সম্ভব হয়।

কোষের মৃত্যু

পাঠকরা অবশ্য অবগত আছেন যে আমাদের দেহটি মূলত ক্ষুদ্র আয়তনের অসংখ্য কোষের সমষ্টি। আর প্রতিটি কোষ আসলে স্বয়ং একেকটি জীবন্ত বস্তু। কোষ কিভাবে বিভক্ত হয় সে ব্যাপারে বিজ্ঞানের গবেষণা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোষের মৃত্যুর উপর তেমন বেশী স্ট্যাডি হয় নি। এই গেল শতকের সত্তুর দশকের শেষের দিকে 'সেল ডেথ' শিরোনামে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়। এতে এটাই প্রমাণ হলো যে, কোষের মৃত্যুর ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি- বা মানুষের মৃত্যুর পূর্বে কোষের আদৌ মৃত্যু হয় কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।

আজকাল অবশ্য কোষের মৃত্যুর মৌলিক কারণসমূহ মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। কোষ 'এরোবিক রেসপিরেশন' নামক শ্বাস-ক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকে- তথা কর্মশীল হয়। এই ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়, যখন শ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস ফুসফুসে নেওয়ার পর তা রক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোষে যেয়ে পৌঁছে। সুতরাং অক্সিজেনের অভাবে কোষ মরে যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়লে কোষ মরে যেতে পারে। তৃতীয়তঃ রোগ জীবাণুর হামলায়ও কোষের জীবনাবসান ঘটে থাকে। এছাড়া আরো কয়েকটি কারণে কোষ মারা যেতে পারে যেমন, অতিরিক্ত তাপ; দেহের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণ; এবং বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত দ্রব্য যা পরিপাকতন্ত্র থেকে আসতে পারে।

কোষ আরো একটি বিশেষ কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে- তাহলো এটার ডিজাইন। আল্লাহ পাক একে তৈরীর সময়ই একটি দির্নিষ্ট কাল পর্যন্ত আয়ু দিয়ে থাকেন। এরূপ একটি কোষ হলো রক্তের মধ্যস্থ হিমোগ্লবিন নামক কোষ। এর আয়ুষ্কাল ১০০ থেকে ১২০ দিন মাত্র। তবে এই কোষ আমাদেরকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর প্রাপ্তিতে যাতে ঘাটতি পড়ে না সেটা নিশ্চিত করতে হাড্ডির মজ্জায় এটি প্রতিনিয়ত উৎপাদিত হচ্ছে। অন্যান্য কোষও বয়সের সঙ্গে মরে যায়। এরূপ কোষ-মৃত্যুকে বলে 'প্রোগ্রাম্‌ড সেল ডেথ'। এসব কোষ বিশেষ সংখ্যক কোষ-বিভক্তি শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। একটি দৃষ্টান্ত হলো মাথার চুল। চুলের বিশেষ কিছু কোষ তাদের কার্যকারিতা চুল স্বয়ং বেড়ে ওঠার ক্ষমতা হারানোর অনেক বছর পূর্বে হারিয়ে ফেলে। ফলে আমাদের মাথায় আত্মপ্রকাশ করে বুড়ো হওয়ার সংকেত স্বরূপ 'রংহীন' শ্বেত চুল।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যু

ক্লিনিকে কোন রোগীর মৃত্যু ঘটলে কর্তব্যরত ডাক্তারকে এক পর্যায়ে অবশ্যই 'রোগী মৃত' বলে ঘোষণা দিতে হবে। তবে এই ঘোষণায় ত্রুটি থাকলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াতে পারে। কেউ তো চাইবে না যে, তার

আপনজনের মৃত্যু আসার আগেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেওয়া হোক! কিন্তু একজন ডাক্তারকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। মৃত্যু ঠিক কখন ঘটেছে তা তাকে সনাক্ত করতেই হবে। সুতরাং ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বলতে কী বুঝায়? মানবদেহের কোষের মৃত্যু হলেও কাউকে মৃত বলা যাবে না। তবে হ্যাঁ, দেহের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র যেমন হৃদযন্ত্র, মগজ ইত্যাদির যাবতীয় কোষ যদি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন ভিন্ন কথা।

মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা সর্বক্ষেত্রে সহজ-সরল ব্যাপার নয়। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত মৃত্যুপরবর্তী অনেক ব্যাপার। তাই শুধুমাত্র রসায়নিক দিক থেকে বিবেচনা করে মৃত বলা সঠিক হবে না। তবে হ্যাঁ, সাধারণত আমরা যখন লক্ষ্য করি মৃত্যু পথযাত্রী 'সাকরাতুল মাউথ' এর অবস্থায় চলে গেছেন তখন আমরা এই ব্যক্তি পুনরায় স্বাভাবিক জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসার সকল আশা ছেড়ে দিই। এই নিরাশার কারণ হলো যুগ যুগব্যাপী মানুষের অভিজ্ঞতা। মানুষ যখন মরে তখন এই সর্বশেষ অবস্থায় পতিত হয়- ব্যাপারটি অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেছে। সাকরাতের অবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে, চেতনার বিলুপ্তি। তবে সাধারণ বিলুপ্তি নয়- যে বিলুপ্তির অবস্থা থেকে ফেরানো অসম্ভব সেরূপ চেতনার বিপুপ্তি হলো সাকরাতুল মাউথ। এই অবস্থায় মানুষ তখনও মরে যায় না- কারণ তার মধ্যে অবশিষ্ট থেকে যায় শ্বাসক্রিয়া। সাকরাতুল মাউথের অবস্থায় কিছুক্ষণ থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত অতিবাহিত হতে পারে। অজ্ঞান অবস্থায় যদি কোনভাবে খাদ্য দেহের ভেতর যেতে থাকে তাহলে এটাকে সাকরাতুল মাউথ বলা যায় না। আর এরূপ অবস্থায় কেউ কেউ বছর পর্যন্ত অজ্ঞান থাকার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

যেই মুহূর্তে সাকরাতুল মাউথের অবস্থায় থাকা ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, তখনই আমরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করি। সুতরাং চেনতার বিলোপ ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেই মানুষ মরে যায়। এই উভয় অবস্থা তখনই আত্মপ্রকাশ করে যখন মগজের কাণ্ড বা ব্রেন স্টেম সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্রেন স্টেমের উপরের অংশ চেতনার অনুভূতির উৎপত্তিস্থল। কিন্তু স্বয়ং চেতনার বিষয়বস্তুর অবস্থান

আমাদের মূল মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যমান যার নাম 'সেরেব্রেল হেমিস্ফেয়ার'। সেখানে থাকা চেতনাকে অনুভব করার পূর্বশর্ত হলো কর্মক্ষম ব্রেন স্টেম। সুতরাং মগজের অন্য কোথাও চেতনার জন্ম নিলেও যদি ব্রেন স্টেম অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে কখনো তা আমাদের অনুভুতিতে ধরা দেবে না- অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়ই থেকে যাবো। এ থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, ব্রেন স্টেমই হলো 'চেতনা অনুভবের' জন্য দায়ী। বিজ্ঞান এই চেতনা অনুভবের স্বীকৃতি দিয়ে রসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আত্মার' অস্তিত্বকে স্বীকার করার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে কি আমরা ধরে নেবো, 'মানুষের ব্রেন স্টেম ও আত্মার সমন্বয়ে আমাদের মাঝে জন্ম নেয় চেতনা'? আপাতদৃষ্টিতে এর জবাব হ্যাঁসূচক বলেই মনে হয়। কারণ ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর অর্থই হলো ব্রেন স্টেমের কার্যক্ষমতার সম্পূর্ণ অবসান- যা পুনরায় সচল করা অসম্ভব। আর এই অবস্থা তখনই হয়ে থাকে যখন মানুষ মারা যায়- কারণ যে দু'টি বিশেষ ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার নাম মৃত্যু তথা এক. সম্পূর্ণরূপে চেতনার বিলোপ ও দুই. শ্বাসক্রিয়ার অবসান, এই উভয়টির নিয়ন্ত্রক হলো ব্রেন স্টেম। সে যখন নিজেই অকেজো তখন ঐ দু'টি ক্রিয়া সচল থাকার কোন প্রশ্নই উঠেনা। আত্মা ও ব্রেন স্টেমের এই সম্পর্ক একটি নতুন ধারণা। এখন প্রশ্ন জাগে, আত্মার প্রস্থান হেতু ব্রেন স্টেম মারা যায় না ব্রেন স্টেমের মৃত্যুর কারণে আত্মা প্রস্থান করে? এই জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। একদিকে বলা যায়, উভয়টি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাও শুধু ধারণা মাত্র। এ ব্যাপারে একমাত্র সেই মহান বিশ্বপ্রভু আল্লাহ পাকই অবগত যিনি এগুলো সৃষ্টি ও পালন করছেন।

ব্রেন-স্টেম মৃত্যু

আমাদের মগজের কাণ্ড বা স্টেম যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ আমাদের মৃত্যু ঘটবে না। মানুষের মৃত্যুর কারণ অনেক ধরনের হতে পারে। সরাসরি কোন আঘাতের মাধ্যমে যদি ব্রেন স্টেম মারাত্মকভাবে অকেজো হয়ে যায় আর তা তাড়াতাড়ি মেরামত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়

তাহলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। এছাড়া অন্য কোন কারণে যেমন বিশেষ রোগ-ব্যাধি, যদি আমাদের ব্রেন স্টেম সম্পূর্ণ অকেজো হয় তাহলেও আমরা আর বাঁচতে পারবো না। ব্রেন স্টেম যদি কোনভাবে অকেজো হয়ে যায় তাহলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়বে। এই অবস্থাকে বলে 'আপ্‌নিয়া' যার অর্থ হলো কোন কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের পূর্বেই শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে কেউ যদি দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়ে মাথার মধ্যে মারাত্মক আঘাত পায় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে আপ্‌নিয়ার মাধ্যমে। প্রথমে চেতনা বিলুপ্ত হয় ও পরে আপ্‌নিয়া সংঘটিত হয়- তথা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের পূর্বে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে মৃত্যুকে বলে 'ব্রেন স্টেম মৃত্যু'।

ব্রেন স্টেম মৃত্যু হার্ট এটাকের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। যদি হার্ট এটাক হওয়ার পর কৃত্রিম উপায়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে পুনরায় কর্মশীল করা সম্ভব না হয় তাহলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মগজের মধ্যে রক্ত যেয়ে পৌঁছে না। কয়েক মিনিট এভাবে চলে গেলে ব্রেন স্টেমের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই আপ্‌নিয়া'র আক্রমণে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়।

ইসলামী দৃষ্টিতে মৃত্যু

ইতোমধ্যে আমরা বিজ্ঞানের আলোকে মৃত্যুর সংজ্ঞা তুলে ধরেছি। কিন্তু মৃত্যুকে ইসলাম ঠিক এভাবে দেখে না। দেহের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কারণ, মানবদেহ সু-কৌশলে সৃষ্ট একটি তন্ত্র মাত্র- একে সজীব ও কর্মক্ষম রাখতে যাবতীয় উপাদান এতে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পারিপার্শ্বিকতা থেকে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ভেতরে নেওয়া ও কার্বন ডাইওক্সাইড বের করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আছে এবং দেহের এনার্জি বা শক্তি যোগানোর উপায় হিসাবে পরিপাকতন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে- অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ ও বৈর্জ নির্গতকরণের সু-ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এটা বলা যায়, সাধারণভাবে কেউ যদি অক্সিজেন গ্রহণ কিংবা খাদ্য থেকে

বিরত থাকে তাহলে সে বাঁচবে না। তার দেহের এ দু'টি খোরাক বন্ধ হয়ে গেলে দুর্বল হয়ে পড়বে- শ্বাসক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিনিট যদি তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মৃত্যু এসে যাবে। আর খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে মাস খানেক কিংবা এর কিছু বেশী সময় পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকতে পারে- কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করতেই হবে।

যা হোক, এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা এটুকু অনুধাবন করলাম যে, মানুষের দেহ বিভিন্ন কারণে মরে যেতে পারে। এসব কারণ নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে মৃত্যু জিনিসটা ঠিক কিভাবে ঘটে এবং মানবাত্মা কোন্ পদ্ধতিতে দেহ থেকে বের হয় এবং কোথায় যায়- এসব প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান থেকে আদৌ পাওয়া সম্ভব নয়। এসব প্রশ্নের জবাব আসে ধর্মবিশ্বাস থেকে।

মানুষ মরণশীল জীবী। জন্ম মানেই একদা মৃত্যু। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। বস্তুত তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে- রোজ কিয়ামতের দিন। যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম। আর দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়" [সূরা আলে ইমরান : ১৮৫]।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে। এক বিলিয়ন হলো এক হাজার মিলিয়ন আর এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ সংখ্যা। এ হিসাবে ১ বিলিয়ন অর্থ ১০*১০০০ = ১০,০০০ লক্ষ বা ১০০ কোটি। সুতরাং বিজ্ঞানীদের মতে ৪ থেকে ৫ শত কোটি বৎসর পূর্বে সৌরজগতের জন্ম। এ হিসাবে আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি গড়ে ৮০ বৎসরই হয় তাহলে পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমাদের জীবন মাত্র ক্ষণিকের! সত্যিকার অর্থে আমরা অতি অল্প সময়ের জন্য এই ধরার বুকে এসেছি। কিন্তু এরই মধ্যে এমন এক আমলী জিন্দেগী গড়ে তুলতে হবে যার ফলে পরকালের অশেষ জীবন হবে শান্তি

ও আনন্দময়। উপরোক্ত আয়াতে করীমে এ কথারই ইঙ্গিত এসেছে যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী জীবন আসছে সামনে আর এজন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। কুরআনে পাকে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

"আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (জন্মের মাধ্যমে), আর এই মাটির মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবো (মৃত্যুর মাধ্যমে) এবং এই মাটি থেকেই আবার তোমাদেরকে পুনর্বার বের করা হবে (রোজ কিয়ামতে)" [সূরা ত্বাহা : ৫৫]।

মৃত্যুর অর্থ হলো রূহের প্রস্থান। ঠিক কিভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তির রূহ বেরিয়ে যায় তার বর্ণনাও পবিত্র কুরআন শরীফে এসেছেঃ

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে চলো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আর আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো" [সূরা ফাজর : ২৭-৩০]।

মানুষ কে কবে এই ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে তার কোন নিশ্চয়তা বা ধারাবাহিকতা নেই। কালামে পাকে জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেঃ

"হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে" [সূরা হাজ্জ : ৫]।

উপরোক্ত আয়াতমালা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারা মৃত্যুর সময় সন্তুষ্টচিত্তে এই ধরার বুক থেকে বিদায় হন। তাদের জন্য মৃত্যু হলো এক বিরাট নিয়ামত কারণ এর ফলেই তারা তাঁদের প্রতিপালকের উত্তম প্রতিদান তথা জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে আছে:

"হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা:) বলেন, একদা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পছন্দ করে, মহান আল্লাহও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতে খুশী হোন। একথা শোনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা:) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত্যু তো কারো নিকট পছন্দনীয় জিনিস নয়! জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আসলে ব্যাপারটা এরূপ নয়- বরং যখন মৃত্যু কারো নিকট বিরাট সৌভাগ্যের সুসংবাদসহ উপস্থিত হয় তখন সে ব্যক্তির নিকট পরকালের যাত্রা হয়ে ওঠে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। অপরদিকে মৃত্যু যখন কারো কাছে মহা শাস্তির পূর্বাভাষ হয়ে উপস্থিত হয়, তখন তার সকল শান্তি ও স্বস্তি চিরতরে হারিয়ে যায়। আর তার জন্য পরপারের যাত্রা হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক"।

মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে সুন্দরভাবে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মৃত্যু যখন মু'মিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয় তখন রাহমাতের ফিরিশতারা বেহেশতের শুভ্র রেশমী বস্ত্রসহ তার নিকট হাজির হয়ে বলেন, হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে চলো সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে। এ ডাক শোনে দেহ থেকে বেরিয়ে আসে বান্দার রূহ- তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে মিশকের সুগন্ধি। সকল ফিরিশতা তাকে শুভ সম্বোধন করেন এবং একে অন্যের হাত থেকে হাত বদলের মাধ্যমে সেই রূহ পৌঁছে যায় আসমানের দরজায় (বস্তুজগৎ ও ঊর্ধ্বজগতের মিলনস্থলে)। সেখানকার ফিরিশতারা দ্বার উন্মুক্ত করে বলেন: এতো দেখছি পবিত্র ও প্রশান্ত রূহ! রূহবাহী ফিরিশতারা তখন বলেন: একে মিলিয়ে দাও পবিত্র রূহগুলোর সঙ্গে। সুতরাং তা-ই করা হয়"।

সুতরাং উপরের বর্ণনাগুলো থেকে এটা এখন আশারাখি সবার নিকট পরিষ্কার হয়েছে যে, মৃত্যু আসলে ঊর্ধ্বলোকের দিকে রূহের প্রস্থান এবং একই সাথে দেহের যাবতীয় সাধারণ ক্রিয়ার অবসানকে বুঝায়। দেহ মাটির মধ্যে চলে যায়- বরং কালে মাটিতেই পরিণত হয়। ঈমানদারের জন্য মৃত্যু তাই হতাশের কোন কারণ নেই। সে যে প্রভুর কাছ থেকে এসেছিল সেই প্রভুর নিকট ফিরে যায় মৃত্যুর স্টেশন পেরিয়ে। আর যদি তার আমল আল্লাহর পছন্দসই হয়ে থাকে তাহলে সে চিরসুখের জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী ছেড়ে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে পাড়ি জমানো। কিছুদিনের জন্য খুব জটিল এবং সুচিন্তিতভাবে সৃষ্ট এক দেহপিঞ্জরে অবস্থানের পর মানুষের আসল সত্তা তথা রূহ তার মূলে ফিরে যাওয়ার নামই হলো মৃত্যু।

চতুর্থ অধ্যায়

আধ্যাত্মিকতা ও মানবদেহ

আলহামদুলিল্লাহ্! প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেহতত্ত্বের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছি। আমরা আমাদের দেহসৃষ্টির অপূর্ব পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ক্রিয়া-কলাপের উপর বেশ গভীরে বিচরণ করেছি। বিভিন্ন জৈবিক বস্তু দ্বারা কিভাবে আল্লাহ পাক দেহের সকল যন্ত্রাংশ তৈরী করেছেন ও এগুলো পালন তথা পরিচালনা ও সংরক্ষণ করছেন তা এখন আমাদের নিকট উন্মোচন হয়েছে। কিন্তু এতো কৌশল, এতো আয়োজন কিসের জন্য? পঞ্চেন্দ্রিয়, চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, ভাব-আবেগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন সঠিকভাবে যাতে মানুষ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তা-ই কী মানবদেহ সৃষ্টির মূল কারণ? আমার মতে এসব ছাড়াও আরেকটি অতি জরুরী ব্যাপার আছে যার বিকাশ ঘটানোর জন্য এরূপ একটি জ্যান্ত উপযুক্ত দেহের প্রয়োজন ছিলো। আর এই অতিরিক্ত গুরুত্ববহ জিনিসটি হলো মানুষের দেহকে আল্লাহ পাক রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র হিসাবেও বানিয়েছেন। শুধু বস্তুজগৎ নয়- আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে দেহকে সম্পর্কিত তথা উপযুক্ত করে তুলতে যেয়েই এতোসব আয়োজন।

আমরা গ্রন্থের এই শেষ অধ্যায়ে এসে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক, বিভিন্ন দেহযন্ত্রের উপর খেয়াল রেখে আল্লাহর জিকির-আজকারের উপকারিতা ও সর্বোপরি দেহতত্ত্ব থেকে আমাদের আল্লাহ-পরিচিতি তথা ইলমে মা'রিফাতের মাত্রা কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এসব ব্যাপার আলোচনা করবো। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আগের দু'টি অধ্যায়ে আমরা যাকিছু শিখেছি তা রেফারেন্স হিসাবে আসবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে অশরীরী, অবস্তু এবং আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট কিন্তু চিরন্তন এই আত্মা নামক জিনিসটি আসলে কী- এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কিছু তথ্যাদি তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

মানবাত্মা

মানুষের রূহ বা মানবাত্মা সম্পর্কে প্রথমেই কুরআন শরীফে বর্ণিত সংজ্ঞা তুলে ধরছি। উল্লেখ্য, রূহ আসলে কোন্ জিনিস সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে খুব একটা বলা হয় নি। যেমন নীচের আয়াতে আল্লাহ পাক এর পরিচয় দিতে যেয়ে ইরশাদ করেছেন:

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলে দিন: রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত- এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" [বনী ইসরাঈল : ৮৫]

অপর আরেক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সাজদাহ : ৯]

অন্যত্র আদমসৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো।" [ছোয়াদ : ৭২]

কিয়ামতের ময়দানে কিভাবে ফিরিশতা ও রূহসমূহ দণ্ডায়মান হবে তার বর্ণনা দিতে যেয়ে মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন: "ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" [মা'আরিজ : ৪]

অন্যত্র: "যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।" [নাবা : ৩৮]

এছাড়া অপর এক আয়াতে করীমে বলা হয়েছে: "এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।" [কদর : ৪]

মানবদেহ সৃষ্টির আগেই যে সুদূর অতীতে আল্লাহ পাক প্রত্যেকের রূহ সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ নিম্নের আয়াত থেকে স্পষ্ট:

"আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।" [আ'রাফ : ১৭২]

উপরে বর্ণিত প্রতিটি আয়াতেই রূহের কথা এসেছে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই। এতে এটাই প্রমাণ হলো যে, প্রথমোক্ত আয়াত তথা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা মুতাবিক রূহ নামক আমাদের আসল উপাদানটি সম্পর্কে আমরা বাস্তবে খুব একটা বেশী জানতে সক্ষম নই। এর কারণ হলো, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষমতাই নেই রূহকে সঠিকভাবে বুঝার এবং অনুধাবন করার। কিন্তু উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে একেবারে নিরাশ করেন নি। বলা হয়েছে, তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অতি অল্পই জ্ঞানদান করা হয়েছে। এতে এটা স্পষ্ট যে, আমরা রূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নয়- বরং ঈমানী আলোকে চেষ্টা-সাধনা, ধ্যান-ফিকির, গবেষণা ও সর্বোপরি আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের আসল সত্তা রূহ কী জিনিস তা-ও কিছুটা হলেও জানতে-বুঝতে সক্ষম হবো। আর এই জানার নামই হলো আধ্যাত্মিকতা তথা রূহানিয়্যাত।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাহ:) রূহ কোন জিনিস তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন কিমিয়ায়ে সাআদাত নামক তাঁর প্রণীত প্রখ্যাত গ্রন্থে। সুতরাং পরবর্তীতে উল্লিখিত রূহ সম্পর্কে পরিচিতিমূলক তথ্যাদি এই কিতাব থেকেই নেওয়া হয়েছে।

ইমাম গায্যালীর মতে, মানুষের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম পদার্থই হলো রূহ। তিনি এই রূহকে দেহরাজ্যের বাদশাহ বলেছেন যার আজ্ঞাবহ সবকিছু। রূহকে দিল, আত্মা, পরমাত্মা কিংবা নফস ইত্যাদি নামেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এই আত্মার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বজ্ঞান তথা মা'রিফাত লাভ, তাঁর অনুপম সৌন্দর্য দর্শন এবং অপার মহিমার উপলব্ধি সম্ভব। মানবদেহে অস্তিত্বশীল এই সূক্ষ্মতম অশরীরী জিনিসটির আসল স্বরূপ জানার উপায় কি? ইমাম গায্যালী (রাহঃ) বলেন, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মানুষই কোন প্রকার সন্দেহ করে না। আমি, আপনি আছি- এ কথার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু বাহ্যিক এই শরীর মানুষের অস্তিত্বের সম্পূর্ণটা নয়- কারণ, মৃত ব্যক্তিরও একটি দেহ থাকে। যদিও তা নির্জীব অবস্থা থেকে পরবর্তীতে রূপান্তর হয়- তথা পচে যায়। আর মরদেহ সেটিকেই বলে যার মধ্যে প্রাণ বা আত্মা নেই। সুতরাং আমরা প্রাণবন্ত বা জীবন্ত এই কারণে যে, আমাদের মধ্যে বাস করে আত্মা। এই আত্মাকে সাধারণ ভাষায় প্রাণও বলা চলে।

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলতে পারি মানুষের দেহটি হলো আত্মা (যা মূলত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বা 'আমর' এর অন্তর্ভুক্ত) অস্তিত্বশীল থাকার জন্য উপযোগী একটি যন্ত্র। এই দেহযন্ত্রের প্রতিটি উপায়-উপাদান এবং কারুকার্য আত্মাকে ধারণ করার জন্য নির্মিত হয়েছে। আর আত্মা মানেই প্রাণ- তথা জীবন্ত থাকার উৎস। যেই মুহূর্তে আত্মা প্রস্থান করবে সেই মুহূর্তেই দেহযন্ত্রের মৃত্যু ঘটবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম গায্যালী (রাহঃ) কিভাবে পুরো মানবদেহকে একটি শহরের সঙ্গে তুলনা করেছেন তার বর্ণনা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দেহশহর

আমাদের দেহকে যদি আমরা একটি শহর মনে করি তাহলে এর হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই শহরের ব্যবসায়ী হিসাবে ধরা যায়। কামনা-বাসনা এই শহরের তহশীলদার বা ট্যাক্স কালেকটর। ক্রোধ এর পুলিশ, আত্মা বাদশা ও বিবেক-বুদ্ধি মন্ত্রী। এখন, বাদশাহকে যদি শহরের

শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয় তাহলে তাকে এর কর্মচারীদের মুখাপেক্ষী হতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মচারী যদি তাদের দায়িত্বপালনে সততা নিষ্ঠাবান না হয় তাহলে পুরো শহরব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দেবেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ট্যাক্স কালেকটর মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চক। বিবেক-বুদ্ধিরূপ মন্ত্রীর নির্দেশ সে প্রায়ই লঙ্ঘন করে বসে। টাকা আত্মসাতের কারণে কোষাগারে অভাব পরিলক্ষিত হয়। অস্ত্রধারী রাগী, দুর্দম, কুস্বভাবসূলভ পুলিশটি খুন-জখম প্রিয়। একটু সুযোগ পেলেই সে তার কুকর্মে লিপ্ত হয়। এখন, এমতাবস্থায় রাজ্যে বা শহরে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বাদশাহরূপ আত্মাকে কি করতে হবে? তাকে অবশ্যই বিবেক-বুদ্ধিরূপ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এগুতে হবে। কামনা-বাসনারূপ দুষ্ট ট্যাক্স কালেকটরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্রোধরূপ পুলিশকে নিযুক্ত করতে হবে। আর পুলিশ স্বয়ং নিজেও যাতে অতি-ক্রোধের শিকার না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। মোটকথা শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আত্মাকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন থাকতে পারে লোভ-লালসা, পানাহার ও ক্রোধ ইত্যাদি গুণাবলী মানুষের মধ্যে থাকার কারণ কি? কারণ এসবের অপব্যবহার হেতু আত্মার রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যা আমরা উপরের বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম। বাস্তবে এসব গুণাবলীরও প্রয়োজন আছে। কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও ক্রোধ থাকায়ই আমরা আমাদের দেহরাজ্যকে রক্ষা করতে পারি। পানাহার করে শরীর রক্ষার জন্য লালসা এবং শত্রু থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজন হয় ক্রোধের।

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আত্মা বা রূহকে আল্লাহপাক সৃষ্টি করে তার সাহায্যার্থে অনেক ধরনের বস্তু দেহের মধ্যে স্থাপন করেছেন। সবই দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য রক্ষার্থে নিয়োজিত আছে। আত্মার সন্তুষ্টিকল্পে বিবেক যা করতে চায় তার অনুভূতি মস্তিষ্কে জাগ্রত হয়ে হাত-পা, জিহ্বা ইত্যাদিকে নির্দেশ প্রদান করে। বাহ্যিক শক্তি তখন শরীরের পেশীতে জন্মলাভ করে সেই নির্দেশকে কার্যে পরিণত করে। সুতরাং আমাদের প্রতিটি কার্য ও একশনের মূল হলো

রূহ। রূহের স্বভাব হলো আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং রূহে সৃষ্ট সঠিক ইচ্ছা বিবেক-বুদ্ধি-অনুভূতির রাস্তা ধরে বাহ্যিক কর্ম দ্বারা একশন ঘটানো হয়। আর এই রাস্তায় যদি কোন ধরনের দুর্নীতিপরায়ণ উপাদান (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য) প্রতাপশালী না হয় তাহলে সঠিক একশনই সংঘটিত হবে। আর এটাই হবে প্রভু-সন্তুষ্টির কারণ। আমাদের রূহ সর্বদাই আখিরাতের উত্তম জিন্দেগীর প্রতি লালায়িত- এটা তার স্বভাব। কিন্তু তারই অধীনস্থ কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যের ফলে সে সফলকাম হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন।

রূহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই দেহযন্ত্র

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, রূহের স্বভাব হলো আখিরাতের জিন্দেগীকে সুন্দর ও সফল করা। এর অর্থ হলো রূহ আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের প্রতি সদা-আকর্ষিত। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রূহকে খুশী রাখার নামই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা। কিন্তু রূহের ইচ্ছাকে বাস্তব আমল দ্বারা ফলবান করার ক্ষেত্রে দেহের মধ্যেই বিরাজ করে অনেক কু-প্রকৃতি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

মনে করুন আপনি একটি ভালো কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে যাত্রা করলেন। এই ভালো কাজটি করার ইচ্ছা প্রথমে আপনার রূহের মধ্যে জাগ্রত হয়ে অনুভূতিতে সক্রিয় হয়েছে। সেখান থেকে মস্তিষ্কে যেয়ে ঐ কাজে যাওয়ার পাথেয়-উপায় হিসাবে একটি নির্দেশের জন্ম নিয়েছে। এই নির্দেশ হলো শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্থির অবস্থা থেকে চলন্ত করা। কিন্তু ঘর থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে 'অলসতা' নামক এক বস্তু এসে আপনাকে বাধা দিলো। সে আপনাকে কানকথায় বললো, 'এত দূরে তুমি যাবে কি করে? রাস্তাঘাট ভালো নয়। শরীর খারাপ করতে পারে!' এই মুহূর্তে যদি আপনার মূল নির্দেশ শক্তিশালী না হয় তাহলে এখানেই 'ভালো কাজে যাওয়ার' রূহের ইচ্ছা বাতিল হয়ে যাবে। যা হোক 'অলসতা' নামক বস্তুকে আপনি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। এখন আপনি রাস্তায়। এবার আরেক সমস্যা আপনার সম্মুখে হাজির হলো। কাম রিপু নামক একটি কু-স্বভাব

প্রবল হয়ে উঠলো- কারণ, রাস্তায় কোত্থেকে এক পরমাসুন্দরী নারী এসে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আপনার কাম রিপু যদি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে আপনি ঐ ভালো কাজে যাওয়া থেকে সহজেই বঞ্চিত হতে পারেন। যা হোক, আপনি এক্ষেত্রেও রক্ষা পেলেন। আপনার কাম রিপু আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে। আপনি অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই এক দুশমন আপনার সম্মুখে! একে দুনিয়া থেকে বিদেয় করে দিতে আপনি বহুদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজ পেয়েছেন! রাগে-গোস্বায় আপনি অগ্নিশর্মা।

আপনি থমকে দাঁড়ালেন! জানি এই দুশমনকে দেখে অগ্রসর হতে পারলেন না মুহূর্তের জন্য। কিন্তু আপনার সেই 'ভালো কাজে যাওয়ার' মূল ইচ্ছা খুব বেশী প্রবল। সুতরাং এযাত্রা রক্ষা পেলেন। রাগকেও থামিয়ে দিলেন। চোখদু'টো নীচু করে চলতে লাগলেন গন্তব্যপথে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে জানলেন, আপনার পরিচিত এক ব্যক্তি হঠাৎ বহু সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। আপনার মনে হিংসার উদ্রেক হলো। ভাবলেন, লোকটির মতো চেষ্টা-তদবিরে লেগে গেলে হয়তো আমিও এরূপ ধনের মালিক হতে পারতাম। এ পর্যন্ত ভাবনায় কোন দোষ নেই- কিন্তু চিন্তার মধ্যে আরেক কথার উদয় হলো। ভাবলেন, আমি যে ভালো কাজের জন্য যাচ্ছি তাতে তো আর দুনিয়াবী কোন স্বার্থ নাই। এভাবে নিঃস্বার্থ কাজে সময় নষ্ট করে দিচ্ছি! ধন কামাইয়ের সময় কোথায়? এই খারাপ ভাবনাটুকু যদি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে এক্ষুণি বারোটা বাজবে। অর্থাৎ সেই ভালো কাজে যোগদান ভণ্ডুল হবে। তবে আপনি হিংসাকেও নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন। তাই এটা জাগ্রত হয়েও আপনাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলতে ব্যর্থ হলো। আপনি চললেন সামনের দিকে।

উপরে বর্ণিত উপায়ে চলার রাস্তায় আপনাকে মনোমালিন্যতা, দুনিয়ার মুহাব্বাত, যশ-খ্যাতির আশা, কৃপণতা, লোভ, লোক দেখানো প্রবণতা, আত্মগর্ব, ধোঁকা ইত্যাদি স্বভাব বিভিন্ন রূপে বাধাদান করতে থাকে। এ সবগুলো বদ-খাসলত থেকে মুক্ত হতে পারলেই আপনি সেই মূল আত্মার নির্দেশ তথা ভালো কাজে যোগদান করে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ

হাসিল করতে পারেন। মোটকথা, আত্মা আমাদের প্রাণ যার স্বভাব হলো উত্তম চরিত্র গঠনে আমাদেরকে পরিচালন। সে সর্বদাই আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আকর্ষিত। তার প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবে রূপান্তরের জন্যই পুরো দেহযন্ত্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাই আমরা আমাদের পালনকর্তার নির্দেশ ও আনুগত্য প্রকাশ করি। ভালো কথা বলতে হলে জিহ্বার মাধ্যমে বলতে হবে। সুতরাং জিহ্বার মধ্যে কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়েছে। শারীরিক ইবাদত করতে হলে প্রয়োজন পেশী শক্তি। ভাল কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য পা ও তাতে শক্তির দরকার। হৃদযন্ত্র দ্বারা প্রতিটি কোষে কোষে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে ওগুলো অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়ে মারা না যায়। ফুসফুস দ্বারা বাইর জগৎ থেকে শ্বাসের মাধ্যমে বাতাস ভেতরে নিয়ে রক্তের মধ্যে অক্সিজেন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের পেশীগুলোর খোরাক হিসাবে খাদ্য-গ্রহণ, প্রয়োজনীয় উপাদান বেরকরণ ও বর্জ্য বাইরে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মস্তিষ্ককে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, সে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশের নড়াচড়াসহ, অতীত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করে রাখে আমাদের সুবিধার্থে। এছাড়া তার আরো অনেক কাজ আছে। এভাবে প্রত্যেকটি দেহযন্ত্র বিভিন্ন দায়িত্বপালনে নিয়োজিত আছে। এ সবই আত্মার সুবিধার্থে। আত্মাকে ধরে রেখে তার নির্দেশ মুতাবিক কাজ করার জন্য দেহকে উপযুক্ত ও কর্মক্ষম করার জন্য সব আয়োজন। সুবহানাল্লাহ!

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটি এখন স্পষ্ট হলো যে, মানবদেহ মূলত আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সবকিছুর কেন্দ্রস্থল। আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যাবলী সৃষ্ট জগতে বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে আল্লাহ পাক আমাদের দেহটিকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। আর এর ফলেই মানবদেহ এতো জটিল, এতো চিত্তাকর্ষক ও কারুকার্যসম্পন্ন। আধুনিক বিজ্ঞানের সুবাদে আজ আমরা দেহযন্ত্রের প্রতিটি পার্টস বা অংশ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করেছি। অতি ক্ষুদ্র কোটি কোটি কোষের মাধ্যমে সৃষ্ট দেহের বিভিন্ন অরগ্যান বা যন্ত্রাদি কিভাবে তাদের স্ব-স্ব ফাংশন আঞ্জাম দিচ্ছে তা আমরা আজ অনেক বেশী অবগত হয়েছি। এমনকি আমরা কোষের অভ্যন্তরস্থ

বিভিন্ন কার্যাদি নিয়ে গভীর গবেষণা চালাতে সক্ষম হয়েছি। এর ফলে শুধু মেডিক্যাল বিজ্ঞানের উন্নয়ন তা-ই নয়, আমরা আমাদেরকে আরো বেশী চিনতে-জানতে সক্ষম হচ্ছি। কতো জটিল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি ডিজাইন আমাদের এই দেহটি! আমরা একে জেনে অবশ্যই প্রশ্ন করি- যে এই দেহটিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি স্বয়ং নিজে না জানি কতো সুন্দর! কতো মহিমাময়! মহা বিজ্ঞানী!

দেহের বিভিন্ন অংশ ও জিকির-আজকার

মানবদেহ মূলত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অরগ্যান বা দেহযন্ত্রের সমষ্টি। পূর্বের অধ্যায়সমূহে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এসব দেহযন্ত্রের সরাসরি কোন সংযোগ আছে কি না সে প্রশ্ন এখনও উন্মুক্ত। তবে সুফিয়ায়ে কেরাম মানবাত্মাও মূলত একাধিক অরগ্যানের সমষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এসব অরগ্যানকে বলে লতীফা। লতীফার অর্থ সূক্ষ্মতা। বিভিন্ন সুফি তরীকা (রাস্তা) এসব লতীফার অবস্থান মানবদেহের নির্দিষ্ট কিছু স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। প্রত্যেকটি লতীফার উদ্দেশ্য আছে ও এর মধ্যে ক্ষমতাও বিদ্যমান। এখন আমরা বিভিন্ন সুফি তরীকায় এসব লতীফার অবস্থান, ক্ষমতা, জিকিরের প্রভাব ইত্যাদি ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাচ্ছি।

কাদিরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরীকা

কাদিরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরীকা অনুযায়ী মানবদেহে মোট ১০টি লতীফা আছে। এগুলো হলো: ১. কল্‌ব - বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ২. রূহ - ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ৩. সির - বাম স্তনের দু'আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে; ৪. খফী - কপালের মধ্যে সিজদার স্থানে; ৫. আখফা - মাথার তালুর মাঝখানে; ৬. নফ্‌স - নাভীমূলে; ৭. আব; ৮. আতশ; ৯. খাক; এবং ১০. বাদ। শেষোক্ত চারটি দেহের সর্বত্র বিরাজমান।

নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকা

নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকা অনুযায়ী মানবদেহে মোট ১০টি লতীফা আছে। এগুলোর নাম ও অবস্থান হলো: ১. কল্‌ব: এর স্থান বাম স্তনের ২ আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ২. রূহ: এটা ডান স্তনের ২ আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে; ৩. সির: এর স্থান বাম স্তনের ২ আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে; ৪. খফী: ডান স্তনের ২ আঙ্গুল উপরে কিছুটা বুকের দিকে অবস্থিত; ৫. আখফা: এটা কলব ও রূহের মধ্যবর্তী স্থানে বুকের কড়ির নীচে অবস্থিত; এবং ৬. নফস: নফসের অবস্থান হলো কপালের সিজদার স্থানে। বাকী চারটি তথা আব, আতশ, বাদ ও খাকের কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নেই, এগুলো দেহের সর্বত্র বিরাজমান।

ভারত উপমহাদেশে জনপ্রিয় চারটি তরীকা অনুযায়ী লতীফাসমূহের নাম ও অবস্থান উপরে লিপিবদ্ধ করেছি। লক্ষ্য করুন শেষোক্ত চারটি (তথা আব, আতশ, বাদ ও খাক) লতীফার নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। এর কারণ হলো, এসব দ্বারাই আমাদের দেহটি সৃষ্ট। এসব শব্দের অর্থ যথাক্রমে পানি, আগুন, বাতাস ও মাটি। আগের দিনে মানবদেহ এই চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট বলে মনে করা হতো। এখনও তা গ্রহণযোগ্য- কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান উপরোক্ত যুক্ত পদার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যস্থ আরো অনেক মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করেছে মাত্র। সুতরাং এখন যদি বলা হয় শতাধিক পদার্থ দ্বারা আমাদের দেহটি সৃষ্ট- তাহলে বুঝতে হবে পানির মধ্যে আছে একাধিক মৌলিক পদার্থ বা ইলেমেন্ট যথা: অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। অনুরূপ আগুনে আছে একাধিক পদার্থ। বাতাস ও মাটিতেও অনেক ধরনের মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান।

লতীফার ক্ষমতা

অধিকাংশ তরীকা অনুযায়ী প্রতিটি লতীফার অবস্থান ও ক্ষমতা আছে। সাধারণত সকল তরীকায়ই লতীফায়ে কলব এর অবস্থান আমাদের হৃদযন্ত্রের মধ্যে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হার্টের ভেতর এই লতীফার অবস্থান। বাস্তবে আরবীতে কলব শব্দের একটি অর্থও হার্ট।

আধ্যাত্মিক এই শক্তির উৎস গোশ্‌তের তৈরী হৃদযন্ত্রের সঙ্গে থাকায় এই লতীফার দিকে খিয়াল করে জিকির-মুরাকাবা করলে এর মধ্যে শক্তির সঞ্চার হয়। অনেকের মতে মানসিক দিক ছাড়াও শারীরিক দিক থেকেও কলবের জিকির বিশেষ উপকারী। হৃদযন্ত্র আমাদের দেহের সর্বত্র রক্ত সঞ্চলন কাজ সারে। সুতরাং প্রতিটি স্পন্দন যদি আল্লাহর জিকিরসহ সংঘটিত হয় তাহলে রক্তের মধ্যে জিকিরের প্রভাব পড়বে। এভাবে রক্তের মাধ্যমে জিকিরের আওয়াজ সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়ে পুরো মানবদেহে আল্লাহর স্মরণের এক অপূর্ব ক্রিয়া স্থায়ী হয়।

লতীফায়ে রূহের স্থান যেহেতু ডানদিকে তাই বলা যায় এটা লিভারের ভেতর অবস্থিত। আমরা আগের একটি অধ্যায়ে লিভারের বিভিন্ন কার্যাদির বর্ণনায় বলেছি এর মোট ৫০০টি ফাংশন আছে। সুতরাং রূহের দিকে খিয়াল করে জিকির-মুরাকাবা করলে স্বভাবতই লিভারের মধ্যে প্রভাব পড়বে। এতে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। তদ্রূপ অন্যান্য লতীফার দিকেও গভীর ধ্যান করে আল্লাহর নামের জিকির করলে ওসব স্থান ও আশ-পাশের দেহযন্ত্রে শক্তির সঞ্চার হবে। একটি জিকির আছে যাকে বলে 'সুলতানুল আজকার'। এই জিকির হলো সবক'টি লতীফার মাধ্যমে (অর্থাৎ ১০টি লতীফার দিকে খিয়াল করে) জিকির করা। এই জিকির খুব উচ্চ পর্যায়ের সালিকরা করে থাকেন। মূলত এই জিকির হলো মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা আল্লাহর স্মরণে ডুবে যাওয়া। এই জিকিরের ফলে যাকিরীনের দেহের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে আল্লাহর নাম বেরিয়ে আসে। সে এই জিকিরে বিভোর হয়ে দেখতে ও শোনতে পায় যে, সমগ্র মহাবিশ্বই তার সঙ্গে আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত আছে। এবার একে একে প্রতিটি লতীফার উপর আরো কিছু বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরছি।

লতীফায়ে নফস

এই লতীফা মানবদেহের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটির মূল ঊর্ধ্বজগতে নয় বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। তবে

এই লতীফাকে জিকির মুরাকাবা দ্বারা পরিশুদ্ধ করে তুললে তা 'নফসে মুতমায়িন্নাহ'তে রূপান্তর হতে পারে। মুতমাইন্নাহ অর্থ প্রশান্ত। সুতরাং এই লতীফার খোরাক হলো গুনাহ থেকে বিরত থেকে শান্তশিষ্টতার সাথে অবস্থান করা। এই লতীফার মধ্যে যে রঙ আছে তাহলো হলুদ বর্ণের।

নফস শব্দের অর্থ 'নিজ' বা 'আপন'। এই 'নিজ'-কে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে বিরাট সমস্যায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নফসের দ্বারাই আমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম ও পাপকার্য করে থাকি। কারণ এই নফসের কাজ হলো আমাদেরকে গ্বাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া সবকিছুর প্রতি আকৃষ্ট করা। সুতরাং সুফিরা নফসের সঙ্গে শয়তানের সম্পৃক্ততা সনাক্ত করেছেন। অন্য কথায় শয়তান তার কুমন্ত্রণা এই নফসের মধ্যে দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এই নফসকে 'নফসে আম্মারা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানব মনে যেসব কু-স্বভাবের জন্ম নেয় যেমন লোভ, লালসা, যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কাম-ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি সবকিছুর মূলে যে লতীফা ক্রিয়াশীল তাকেই বলে নফসে আম্মারা। কিন্তু এই নফসকে রূপান্তর করতে হবে। এর ফলে সে সকল কু-স্বভাব পরিত্যাগ করে সু-স্বভাবের অধিকারী হতে পারে। এই রূপান্তরকরণকে বলে 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা নফসের পরিশুদ্ধকরণ।

নফসকে পরিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে মোট ৭টি স্তর আছে। তাসাওউফের পরিভাষায় এই স্তরগুলো হলো:

১. নফসে আম্মারা ঃ এটার কাজ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া যাকিছু আছে (গ্বাইরুল্লাহ) সেদিকে মানুষকে ধাবিত করা। এটা জীবাত্মার অন্তর্ভুক্ত একটি বিরাট শক্তিশালী জিনিস।

২. নফসে লাওয়ামাহ ঃ নফসে আম্মারা যখন গাফলতি ও আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো কোনো কিছুর দিকে ডাক দেয় তখন এই নফস তা শ্রবণ করে ও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই নফসের কাজই হলো জাগতিক অহেতুক ও গুণাহের কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টায় রত থাকা।

৩. নফসে মুলহিমাহ ঃ মানুষ এই অবস্থায় (অর্থাৎ এই নফসের মাধ্যমে) তার প্রভুর পক্ষ থেকে সরাসরি পথ-প্রদর্শনের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়।

৪. নফসে মুতমায়িন্নাহ ঃ মানুষ যখন এই স্তরে উপনিত হয় তখন সে প্রভুর ইচ্ছায় প্রশান্তি লাভ করে। সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. নফসে রাদ্বিয়্যাহ ঃ এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুলের স্তর। এ অবস্থায় মানুষ দুঃখ-বেদনাকে সহজে মেনে নিতে পারে। ভালো ও মন্দ দু'টিই তার কাছে সমান- অর্থাৎ সে জানতে সক্ষম হয় এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সে সর্বদাই তার প্রভুর প্রতি আনন্দিত কারণ, সে আল্লাহর আশিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৬. নফসে মারদ্বিয়্যাহ ঃ এ অবস্থায় সালিক পবিত্র হয়ে যায়। সে আল্লাহর গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়। সে তার নিজস্ব অস্তিত্ব থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। তার চেতনায় থাকেন শুধু একমাত্র মা'বুদ- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা।

৭. নফসে সাফিয়্যাহ ঃ এটাই সর্বোচ্চ মানবিক অবস্থা। এ স্তরে উপনিত হলে মানুষ ইনসানে কামিলের (সর্বোত্তম মানবের) কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সে আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়।

লতীফায়ে কলব

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, প্রসিদ্ধ সকল তরীকা অনুযায়ী লতীফায়ে কলবের স্থান হলো হৃদযন্ত্রের মাঝখানে। সুফিরা বলেন এর মধ্যে একটি রঙ আছে যা হলো রক্তবর্ণ। এই লতীফাই যাবতীয় বাহ্যিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ বলা যায় আমাদের ইচ্ছাশক্তি এই লতীফায় এসে ক্রিয়া করে। যে কোন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার পর এই লতীফা তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই লতীফার দিকে খিয়াল রেখে জিকির-মুরাকাবা করলে তা জাগ্রত হয়ে ওঠবে। এর ফলে আমরা এর দ্বারা যেসব কার্যাদি আঞ্জাম দিচ্ছি তার হাক্বিকাত আমাদের নিকট ধরা পড়বে- সুতরাং আমরা কাজগুলো সঠিক

করছি কি না তা অবগত হয়ে একে নিয়ন্ত্রণে রেখে অগ্রসর হতে সক্ষম হবো।

সুফিরা বলেন, লতীফায়ে কলব জাগ্রত হয়ে উঠলে আমরা জিন্নাত জাতি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করতে পারি। আরবীতে হৃদযন্ত্রকেই কলব বলে। তবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কলব বলতে এই হার্ট বা হৃদযন্ত্র নামক দেহযন্ত্রকে বুঝায় না- বরং এটা হলো 'আত্মিক হৃদযন্ত্র বা কলব'। বিভিন্ন সুফি শায়খ বিভিন্নভাবে কলবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেন এটাই হলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শক্তির মূল। অন্যদের নিকট কলব হলো ইশকে ইলাহী তথা ঐশী ভালোবাসার সূক্ষ্ম অবস্থান। তবে অধিকাংশের মতে এই কলব হলো দু'টি যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর রণক্ষেত্র। এই দু' আর্মির একটি হলো লতীফায়ে নফসের নিয়ন্ত্রণে আর অপরটি লতীফায়ে রূহের নিয়ন্ত্রণে।

সুফি দর্শনে নফসের উচ্চাংশকে বলে 'আক্বল' বা বুদ্ধি। একে 'নফসে নাতিক্বা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নফসে নাতিক্বা মূলত 'যুক্তিভিত্তিক আত্মা'। এই নফসই হলো কলবে ক্রিয়াশীল মূল চালিকাশক্তি। এটাকে বলা যায় নফসের দিকের যুদ্ধনায়ক। অপরদিকে রূহ বা আত্মা সর্বদাই ঐশী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতিবেশী 'যুক্তিবাদী' হয়ে ওঠলে মানুষ ধীরে ধীরে নাস্তিকতার অভিশাপে নিমজ্জিত হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ্)। সুতরাং এই অধঃপতন থেকে রক্ষার উপায় রাব্বুল আলামীন আমাদের মধ্যেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। খুব বেশী জিকির-মুরাকাবার মাধ্যমে লতীফায়ে কলবকে কলুষমুক্ত করে দিলে এতে ভেসে ওঠবে মহাসত্যের নূর। কলবকে এভাবে পরিষ্কারকরণকে বলে 'তাযকিয়ায়ে কলব' বা আত্মশুদ্ধি। একমাত্র পরিশুদ্ধ কলবে হাক্বিকাতের নূরের আত্মপ্রকাশ ও ইশকে ইলাহী প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

আমরা দেহের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক্স তথা কোষের উপর বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি তুলে ধরার সময় বলেছি কিভাবে রক্ত থেকে প্রতিটি কোষ অক্সিজেন গ্যাস পেয়ে থাকে। এই গ্যাস না পেলে কোষ মরে যাবে। আর

কোষের মরণ মানে পুরো মানবদেহের মরণ। সুতরাং বলা যায়, কোষকে বাঁচিয়ে রাখার মূল খাদ্য হচ্ছে অক্সিজেন। ঠিক তদ্রূপ দেহের মধ্যস্থ আধ্যাত্মিক যন্ত্রাদি তথা লতীফাসমূহেরও খাদ্য আছে। সেমতে লতীফায়ে কলবের খাদ্য হলো যিকরুল্লাহ। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে কলব সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যস্থ আবর্জনা পরিষ্কার হয় এবং এতে হাক্বিকাত তথা মা'রিফাতের নূর প্রতিবিম্ব হয়ে মানুষকে প্রভুর আনুগত্যশীল বান্দায় রূপান্তর করে। অনেক সুফি কলবের দিকে খিয়াল রেখে যিকির-মুরাকাবা ছাড়াও নামায আদায়ের পন্থা বলে দিয়েছেন। নামাযে খুজুখুশু তথা একাগ্রতা অর্জনে লতীফায়ে কলবের দিকে খিয়াল রেখে নামায আদায়ে বিশেষ সাহায্য ও উপকার পাওয়া যায়।

লতীফায়ে রূহ

আমরা ইতোমধ্যে রূহের অবস্থান কোথায় তা জেনেছি। এর রঙ হলো সাদা। এই লতীফার খোরাক হলো সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যান ও খিয়াল। জিকির-মুরাকাবার মাধ্যমে একে জাগ্রত ও সতেজ করে তুললে যাকিরীনের মধ্যে আলমে আ'রাফ বা আলমে-বরযখ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন হয়। এই জগৎ হলো মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টুকু। একে কবরের জিন্দেগীও বলা যায়। মানব স্পিরিট বা আত্মাকেই রূহ বলে।

আগেই বলেছি মানুষের অপর শক্তিশালী লতীফা কলবের সঙ্গে রূহের যুদ্ধ চলছে। রূহের কাজ হলো 'আধ্যাত্মিক' তথা ঐশী জ্ঞানের উপর প্রাধান্য। অপরদিকে কলবের ওজন 'যুক্তিবাদ' এর দিকে ভারী। রূহ থাকার ফলেই আমরা জ্যান্ত আছি। এর অবর্তমানে দেহের যাবতীয় বস্তু প্রাণহীন হয়ে পড়ে। রূহ যখন বের হয়ে যায় তখন মানুষের জাগতিক মৃত্যু ঘটে।

সকল লতীফার মতো রূহ একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বস্তু। এটা সৃষ্ট কিন্তু অবিনশ্বর। এই রূহ মৃত্যুর পর অন্যত্র চলে যায়। সৃষ্টির সময় এটি

'আলমে আরওয়াহ' বা রূহানী জগতে অবস্থান করতো। সেখানে সে ছিলো কলুষমুক্ত অবস্থায়। সে তার প্রভুকে জানতো এবং সর্বদা ইবাদাতে মশগুল থাকতো। কিন্তু মানবদেহে অবস্থান নিয়ে সে আগের অবস্থার কথা ভুলে গেছে। নফসে আম্মারা তথা মানবিক কু-প্রবৃত্তির প্রভাবে সে কলুষিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং একেও তার খোরাক যোগান দিতে হবে। আল্লাহর ধ্যান, ইবাদাত ও জিকির দ্বারা তার মধ্যস্থ সকল দোষ-ত্রুটি তথা আবর্জনা মুছে ফেলা চাই। এই দোষ-মুক্তকরণকে বলে 'তাযকিয়ায়ে রূহ' বা রূহের পরিশুদ্ধি। পরিশুদ্ধ রূহ হাক্বিকাতের নূরে আলোকিত হয়ে ওঠে।

লতীফায়ে সির

বক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থানরত এই লতীফা একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বস্তু। যে খাদ্যে এটি জাগ্রত ও কর্মশীল হয়ে ওঠে তাহলো গভীর মুরাকাবা। এটা সক্রিয় হলে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। এছাড়া এই লতীফার মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই লতীফার রঙ হলো সবুজ। লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে এর সম্পর্ক। এ কারণেই একে তত্ত্বজ্ঞানের কেন্দ্র বলা হয়েছে। আলমে মিছাল বা রূপক জগত হলো লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত জ্ঞানের প্রতিবিম্বস্বরূপ। জিকির-মুরাকাবার মাধ্যমে যখন লতীফায়ে সির সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবে তখন যাকিরীন এই আলমের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে থাকবে। এর কারণ হলো লতীফাটির মূল যেহেতু লাওহে মাহফুযে তাই আলমে মিছালে প্রকাশিত বস্তু এতে প্রতিবিম্ব হয়। আমাদের দেহে 'চেতনা' নামক ক্ষমতার সঙ্গে এই লতীফার সম্পৃক্ততা বিদ্যমান।

সির এর অর্থ হলো 'গোপন রহস্য'। সুফিরা বলেন, এই সিরকে 'শূন্য' করতে হবে। এই শূন্যকরণকে বলে 'তাক্বলিয়ায়ে সির'। কিভাবে শূন্যকরণ সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন, এই লতীফার দিকে খিয়াল করে আল্লাহর গুণবাচক নামের (বা ইসমে সিফাতের) জিকির করতে হবে। এর ফলে সির এর মধ্যে ঢুকে-যাওয়া জাগতিক সকল বস্তু মুছে যাবে এবং 'চেতনা' আধ্যাত্মিক রহস্য জগতের প্রতি নিবিষ্ট হবে। এই

শূন্যকরণের মাধ্যমে আমরা 'আত্মকেন্দ্রিকতার' বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারি।

লতীফায়ে রূহ ও লতীফায়ে সির এর সমন্বয়ে আমাদের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করে তাকে সুফিদের ভাষায় 'রূহে ইনসানী' বা মানবাত্মা বলে। আল্লাহর 'আমর' বা নির্দেশের দ্বারা এটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

লতীফায়ে খফী

এই লতীফার সঙ্গে নীল রঙের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই লতীফার চাহিদা হলো আধ্যাত্মিকতার দিকে উৎসর্গ সাধন করে নিজের সত্তাকে বিলুপ্ত বা ফানাফিল্লাহর স্তরে নিয়ে উপনীত করা। এই লতীফার মধ্যে চেতনা ও সজীবতা আসে সর্বদা এর দিকে খিয়াল করে ইসমে যাতের তথা 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির করার মাধ্যমে। এই লতীফাই মানুষকে সর্বদা আল্লাহর সামনে উপস্থিত রাখে। খফী শব্দের অর্থ গভীর রহস্য। সুতরাং আল্লাহর ধ্যানের মূলে এই লতীফা ক্রিয়াশীল আছে। এরই মাধ্যমে আমরা 'অন্তর্জ্ঞান' লাভ করি।

লতীফায়ে আখফা

আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম এই লতীফার নূরের রঙ হলো সম্পূর্ণ কালো। আখফা শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে রহস্যাবৃত, অস্পষ্ট বা অতিসূক্ষ্ম। এ কারণেই অধিকাংশ সুফির মতে এই লতীফা মানবদেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অরগ্যান মগজের গভীরে কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত। তবে কেউ কেউ এর অবস্থান মানবদেহের ঠিক মধ্যস্থল তথা বুকের কড়ির নীচে বলেছেন। মানবদেহে এই লতীফাকে 'এককত্বের বিন্দু' বলা হয়েছে। আরবীতে এই বিন্দুকে বলে 'নুকতায়ে ওয়াহিদা'। এই লতীফায়ই আল্লাহর তাজাল্লি (হাক্বিকাতের নূর) উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতে বিরাজ করে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান। ধ্যান-মুরাকাবা ও জিকিরের মাধ্যমে যাকিরীন এই লতীফাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলার পর তার অন্তর্দৃষ্টি

এতে পতিত হয়। তখন সে নিজের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই লতীফা মূলত গভীরভাবে প্রভু-উপলব্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এই লতীফার খোরাক হলো শহুদ। আর শহুদ মানে আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মাক্বাম। এই মাক্বামে পৌঁছে গেলে তরীকতের সালিক আপন সত্তাকে হারিয়ে একমাত্র স্রষ্টাকেই সবকিছুর মধ্যে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তাছাওউফের ভাষায় একেই বলে 'ফানাউল ফানা' অর্থাৎ বিলুপ্তির মধ্যে বিলুপ্তি। এই উচ্চতর মাক্বাম শুধুমাত্র উচ্চ পর্যায়ের সুফি ওলিআল্লাহদের জন্য খাস। সর্বশেষ এই মাক্বামে পৌঁছা সবার জন্য আদৌ সম্ভব নয়। এখানে প্রবেশ শুধুমাত্র চেষ্টা-সাধনা কিংবা জিকির-মুরাকাবা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মুহাব্বাতের ফলস্বরূপ লতীফায়ে আখফার মাক্বামে যেয়ে পৌঁছা যেতে পারে। আমরা আল্লাহর দরবারে তাঁর করুণার দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নামাযে লতীফাসমূহের ক্রিয়া

আধ্যাত্মিকতার উপর সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার শেষাংশে এসে লতীফাসমূহ কিভাবে নামাযের মধ্যে ক্রিয়া করে সে ব্যাপারে কিছু তথ্যাদি এখন তুলে ধরছি। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন প্রসিদ্ধ খলীফা হযরত মাওলানা মসীউল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শরীয়ত ও তাসাওউফ' নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আমি এখানে তাঁর এই মহামূল্যবান গ্রন্থ থেকেই নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করছি।

আমরা ইতোমধ্যে মানবদেহে অবস্থিত ৬টি মৌল বস্তু তথা লতীফাসমূহের উপর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরেছি। তাসাওউফপন্থীদের জন্য এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা একান্ত জরুরী। তবে আমরা সাধারণ মানুষও এসবের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত থাকা ঠিক হবে না। ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে নামায একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আসছোলাতু মিফতাহুল জান্নাহ” - নামায বেহেশতের চাবি।

নামাযকে সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে কিভাবে ৬টি লতীফা এতে ক্রিয়া করে তা একটু জানা দরকার। সুফিরা বলেন, নামাযের ৭টি স্তর আছে। এগুলো হলো:

১. সালাতে তন (দৈহিক নামায): এই অবস্থার হাক্বিকাত হলো বান্দাকে অন্তত নামায আদায়কালে গুণাহ থেকে মুক্ত থাকতে হয়। বান্দাহ পাপকার্যে যাওয়া বা পতিত হওয়া থেকে নামাযের ওয়াসিলায় রক্ষা পেল। ৬টি লতীফা ছাড়াও যে আরো চারটি লতীফা তথা আব, আতশ, বাদ ও খাক এগুলোর দ্বারাই গুণাহের কাজ বাস্তবে রূপান্তর হয়। আর এ চারটি বস্তু দ্বারাই মানবদেহ গঠিত। এগুলো দেহের সর্বত্র বিরাজমান। শরীরের সকল অংশেই এই চার লতীফার প্রভাব আছে। সুতরাং সমগ্র শরীর নামাযের মধ্যে লিপ্ত থেকে গুণাহের বদলে ইবাদতে মশগুল হয় যা বান্দার জন্য ইহ-পরকালে কল্যাণের কারণ।

২. সালাতে নফস (আত্মিক নামায): নফসকে নামাযের মধ্যে নিবদ্ধ রাখার ফলে দুনিয়া ও অপরাপর সৃষ্ট জীবের প্রতি মনের আকর্ষণ ও ভালবাসা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্য কথায় যেহেতু গাইরুল্লাহর প্রতি আকর্ষণ মূলত নফসের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয় তাই একে নামাযের মধ্যে রাখার ফলে সে সেদিকে মনের আকর্ষণ পতিত করা থেকে বিরত থাকে। তবে নামাযরত অবস্থায়ও এসব নফসানী খেয়াল এসে যেতে পারে- বরং অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে আসে-ই। এ ক্ষেত্রে সবাইকে খিয়াল রাখা উচিত যে, গ্বাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ নামাযের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলে সাথে সাথে পুনরায় আল্লাহর দিকে মনকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এভাবে পুরো নামাযে যতোবার নফসানী খিয়াল এসে বাঁধা দেবে ততোবারই আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী। এতে আশা করা যায়, নামাযরত অবস্থায় নফসানী খিয়ালের প্রতারণা থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। মোটকথা, লতীফায়ে নফসের

দিকে খিয়াল রেখে নামায আদায় করলে গাইরুল্লাহর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩. সালাতে ক্বলব (অন্তরের নামায): নামাযী ব্যক্তি যখন লতীফায়ে ক্বলবের দিকে খিয়াল করে নামায করবে তখন সে অসাবধানতা ও অন্যমনষ্কতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। নামাযে খুজুখুশু বা একাগ্রতা আসবে।

৪. সালাতে রূহ (প্রাণের নামায): রূহ লতীফার দিকে মনোনিবেশের মাধ্যমে যে নামায আদায় হয় তা সাধারণ নামাযীর জন্য সর্বোত্তম নামায। কারণ, এই পর্যায়ে নামাযীর দৃষ্টি যাবতীয় জাগতিক বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তা একমাত্র আল্লাহমুখী হয়। এই অবস্থায় অন্তর বা বাহ্যিক চোখ দ্বারাও অন্য কোন কিছুর প্রতি খিয়াল করা সম্ভব হয় না।

৫. সালাতে সির (বাহ্যিকতার ঊর্ধ্বে নামাযের যে প্রকৃত ও অভ্যন্তরস্থ অবস্থা): এই লতীফার দিকে মনোনিবেশ করে নামায আদায়ের মাধ্যমে নামাযীর চক্ষু ও অন্তর সম্পূর্ণরূপে জাগতিক সবকিছু থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। সে তখন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধ্যান-খিয়াল ও মনোনিবেশ করে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করে। এভাবে নামায আদায়কালে এক অপূর্ব স্বাদ অনুভূত হয়, যার ফলে নামাযী নামাযের প্রতি আরো বেশী আকর্ষিত হয়।

৬. সালাতে খফী (গোপনীয়তাসর্বস্ব নামায): এ পর্যায়ে নামাযী ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ পেয়ে যায়। এবার নামাযীর অন্তরের অন্তঃস্থল আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। সে আল্লাহর প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে তাঁর প্রতি আরোও আকৃষ্ট হয়। অন্তরের গভীরে প্রেমাকাঙ্ক্ষার ক্রন্দনে ব্যকুল এই নামাযী সত্যিকার অর্থে মা'রিফাত বা আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানের অধিকারী হয়। লতীফায়ে খফীর সাহায্যে নামায আদায়কারী বান্দা নামায থেকে ফারিগ হতে কষ্ট বোধ করে। নামাযের আসল হাক্বিকাত ও মাহাত্ম্য তার নিকট ফুটে ওঠে।

৭. সালাতে আখফা (নামাযের মধ্যে অতি পরোক্ষ সূক্ষ্মতার সাথে যে জিনিস অনুভব হয়): এই লতীফার নামাযই হলো মু'মিনের জন্য সর্বোত্তম পর্যায়ের নামায। এই নামাযের মাধ্যমে সরাসরি মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যাত (আসল) ও সিফাত (গুণ) অন্তর্চক্ষে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বান্দা তখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ পাকের জাতিসত্তার দর্শন লাভে পরম শান্তি ও মজা অনুভব করে। এই অবস্থায় উপনীত হলে 'আসছোলাতু মি'রাজুল মু'মিনীন' তথা নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ কথাটির বাস্তব অর্থ উন্মোচন হয়। সুতরাং নামাযী দৈনিক যতোবারই নামাযে দাঁড়াবে ততোবারই তার মনে মহানন্দে ভরপুর হয়ে ওঠবে কারণ, সে জানে নামায তাকে আল্লাহর দীদার পর্যন্ত উপহার দিতে সক্ষম। আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মি'রাজের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতলাভে ধন্য হয়েছিলেন, ঠিক তদ্রূপ দৈনিক পাঁচ বার নামাযের মাধ্যমে খাঁটি মু'মিনরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির দ্বারা তাঁর পবিত্র দীদার লাভে ধন্য হয়। এই স্তরের নামাযীরাই মহাত্মন ওলিআল্লাহ। এদের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুব অল্প।

ছয় লতীফার নামায

উপরে আমরা নামাযের মধ্যে বিভিন্ন লতীফার প্রভাব সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এতে লতীফাসমূহের হাক্বিকাতও উন্মোচন হয়েছে। কিন্তু ঠিক কিভাবে লতীফাসমূহ দ্বারা নামায আদায় করা যায়? এ প্রশ্নের জবাবে জগতখ্যাত ওলিআল্লাহ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা এবার তাঁর সেই বর্ণনানুসারে নিম্নে লতীফাসমূহের দিকে খেয়াল রেখে নামায আদায়ের পদ্ধতি তুলে ধরছি।

আগেই বলেছি বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ মিলে মানবদেহে বিরাজ করে মোট ১০টি ভিন্ন সূক্ষ্ম বস্তু যাকে লতীফা বলে। নামাযের মধ্যে পুরো এই দশটি লতীফাই ক্রিয়াশীল থাকে। তবে আব, আতশ, বাদ ও খাক এই চারটি লতীফা যেহেতু দেহের সর্বত্র বিরাজমান তাই এগুলোর উপর খেয়াল

রেখে আলাদাভাবে নামায আদায়ের কোন প্রয়োজন নেই। বাহ্যিকভাবে নামাযের বিভিন্ন আহকাম শারীরিক উপায়ে যখন আঞ্জাম দেওয়া হয় তখনই এসব লতীফার প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে লতীফায়ে নফসসহ আধ্যাত্মিক জগতের অপর ৬টি লতীফার দিকে বিশেষভাবে খিয়াল রেখে নামায আদায়ের জন্য নামাযীকে কিছু ধ্যান-মুরাকাবা করতে হয়। আমরা এবার এসব ব্যাপার বিস্তারিত তুলে ধরছি।

১. দাঁড়ানোবস্থায় লতীফায়ে কলবের দিকে খিয়াল: নামাযের মধ্যে যখন বান্দা তাকবীরে তাহরীমা শেষে দাঁড়িয়ে সূরা-কিরাআত পাঠ করবে তখন তাকে খিয়াল রাখতে হবে লতীফায়ে কলবের দিকে। ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা সূরা-কিরাআত পাঠ করি। এ সময় যদি মনের খিয়াল দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসের উপর যেয়ে পতিত হয় তাহলে নামাযে একাগ্রতা আসবে না। লতীফায়ে কলবের নূর অন্তর চক্ষে দৃশ্যমান হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত খিয়াল অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, লতীফায়ে কলবের রঙ হলো লাল। কিরাআত পাঠকালে কর্ণ থাকবে শ্রবণে নিমজ্জিত। তাই বলা হয়েছে, ইমাম কিরাআত পাঠকালে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং নিজে নিজে নামায আদায়কালে এমনভাবে কিরাআত ও অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করতে হবে যাতে নিজে শোনা যায়, কিন্তু পাশের ব্যক্তির নিকট সে আওয়াজ যেনো না পৌঁছে।

ক্বিয়ামের সময় লতীফায়ে কলবের দিকে খিয়াল রেখে এভাবে বার বার নামায আদায় করলে অচীরেই তা অভ্যাসে পরিণত হবে। নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন সত্যিই বিশেষ কার্যকরী।

২. রুকু অবস্থায় লতীফায়ে রূহের প্রতি খিয়াল: রুকু আদায়ের সময় আমরা দৈহিকভাবে নত হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করি। এ সময় লতীফায়ে রূহের দিকে খিয়াল রাখা দরকার। রুকুর তাসবীহ পাঠের সময় রূহের মধ্যস্থ নূর যাতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে অন্তর চোখে ধরা দেয় সেদিকে ধ্যান করতে হবে। এবারও তাসবীহ পাঠের সময় কর্ণ যেনো তা শ্রবণে নিমজ্জিত থাকে।

রূহের দিকে খিয়াল নিবদ্ধ হয়ে গেলে নামাযীর অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী ছাড়া আর কিছুই প্রতিবিম্ব হয় না। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে অন্তরাত্মা রুজু হয়। প্রত্যেক নামাযের সময় রুকুবস্থায় লতীফায়ে রূহের দিকে খিয়াল রেখে 'সুবহানা রাব্বিআল আজীম' তাসবীহ পাঠে অভ্যস্ত থাকতে হবে। এভাবে মশক করে নামায আদায় করলে অচীরেই এক আশ্চর্য ধরনের উপলব্ধি মনের গভীরে আত্মপ্রকাশ করবে। নামাযের প্রতি আকর্ষণ শতগুণ বেড়ে ওঠবে। একদা যদি আল্লাহর দয়া হয় তাহলে নামাযীর অন্তর চোখে এই লতীফার ধবধবে সাদা রঙ হয়তো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে।

৩. প্রথম সিজদার সময় লতীফায়ে সির এর প্রতি খিয়াল: জাগতিক সবকিছু তথা গ্বাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ হওয়া নামাযের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্তরে উন্নীত হতে প্রথম সিজদার সময় চোখের দৃষ্টি থাকবে নাকের ডগায় কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি থাকতে হবে লতীফায়ে সির এর দিকে। গভীরভাবে এই লতীফার দিকে খিয়াল রেখে সিজদার তাসবীহ আদায় করা দরকার।

লতীফায়ে সির এর রঙ সবুজ। তত্ত্বজ্ঞানের আঁধার এই লতীফার নূর অবলোকন করে নামাযী আল্লাহর বেশী নৈকট্য হাসিল করে। আল্লাহর প্রতি 'সিজদাবনত' হওয়ার হাক্বিকাত তার কাছে উন্মুক্ত হয়। সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, এই সিজদা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুকে বা কাউকে করা বিরাট কুফরী। সিজদা অবস্থায় তাসবীহ পাঠের সময় কর্ণ যেনো তা শ্রবণে নিমগ্ন থাকে। এভাবে লতীফায়ে সিরের প্রতি খিয়াল রেখে সিজদা দিতে দিতে একদা হয়তো আল্লাহর দয়ায় লতীফার স্থানে মৃদ্যু কম্পন ও সবুজ নূরের প্রকাশ ঘটে যেতে পারে। এ অবস্থায় উপনীত হলে বান্দা নামাযের মধ্যে যে অপূর্ব স্বাদ অনুভব করবে তা অন্য কোন উপায়ে হাসিল সম্ভব নয়।

৪. দ্বিতীয় সিজদার সময় লতীফায়ে খফীর দিকে খিয়াল: প্রথম সিজদার পর জলসা শেষে দ্বিতীয় সিজদায় যেয়ে খিয়াল পরিবর্তন করে লতীফায়ে খফীর উপর নিয়ে নিবদ্ধ করতে হবে। নীল রঙে নূরান্বিত এই লতীফা 'ফানাফিল্লাহ' স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় সিজদা শেষেই নামায হয় শেষ হবে না হয় ক্বিয়াম অবস্থায় ফেরৎ যাওয়া হবে কিংবা (চার রাকআত বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামায হলে) বসে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে ক্বিয়াম করতে হয়। আল্লাহর যাত ও সিফাতের মধ্যে নিজেকে বিলীন করাই হলো বান্দার জন্য পরম সৌভাগ্যের অবস্থা। এই বিলুপ্তকরণ দু'টি স্তরে সাধিত হয়: ফানাফিল্লাহ ও ফানাউল ফানা। সুতরাং দ্বিতীয় সিজদা আদায়কালে লতীফায়ে খফীর দিকে খিয়াল রাখলে উপরোক্ত স্তরদ্বয়ের প্রথমটি হাসিল হবে (যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়)। অবশ্য সিজদাবস্থায় আগের মতো কর্ণ তাসবীহ শ্রবণে মগ্ন থাকবে। তবে মনেন্দ্রিয় পুরোপুরিভাবে লতীফার নীল নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য এসব দৃশ্যাবলী নামাযীর অন্তরে আত্মপ্রকাশ করবে না- তবে বারবার নামায আদায় করতে করতে হয়তো আল্লাহর অনুগ্রহে এরূপ উচ্চতর অবস্থায় বান্দাকে তিনি নিয়ে যেতে পারে। আমরা সর্বদাই আল্লাহর পবিত্র দরবারে আশাবাদী। কারণ তিনিই বলেছেন, লা তাকনাতুমির রাহমাতিল্লাহ- আল্লাহর রাহমাত থেকে বঞ্চিত হয়ো না।

৫. আত্তাহিয়্যাতু আদায়ের সময় লতীফায়ে আখফার দিকে খিয়াল: সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও রহস্যাবৃত এই লতীফার নূরের রঙ গাঢ় কালো। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দীদার হাসিলের সূত্র হলো এই লতীফা। নামাযী যখন শান্তভাবে বসে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে তখন সে তার প্রতিপালকের একেবারে নিকটে যেয়ে পৌঁছে যায়। এসময় তার অন্তরের দৃষ্টি যদি লতীফায়ে আখফার উপর স্থির থাকে তাহলে সে হাক্বিকাতের নূরের মধ্যে যে ভাসমান তা উপলব্ধি করবে। নিজেকে তো ভুলবেই- বরং ভুলার মতো ভুলবে। সে ফানাউল ফানা তথা মানবিক আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে যেয়ে উপনিত হবে। সে তখন একমাত্র মহাপ্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ছাড়া কোথাও অন্য কোনকিছু দেখতে পাবে না।

আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে প্রভুর সঙ্গে যে 'কথোপকথন' হয় সে হাক্বিকাত তার নিকট ধরা পড়বে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নামাযে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আশা করা যায় বান্দা তার কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে যেয়ে পৌঁছে যাবে। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মুহাব্বাতের বদৌলতেই এরূপ নামায আদায় সম্ভব। উচ্চ পর্যায়ের ওলি-আল্লাহ, গউস, কুতুব, আবদাল, দরবেশরা অনুরূপ নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হয়ে দুনিয়া-আখিরাতে পূন্যময় জীবনের অধিকারী হয়েছেন।

আমাদের দেহসৃষ্টির অপূর্ব কলা-কৌশলের উপর এই 'দেহতাত্ত্বিক' ক্ষুদ্র গবেষণা থেকে লেখক নিজে ও পাঠকরা উপকৃত হবেন এই আশা রাখি। সর্বোপরি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এরূপ গবেষণা দ্বারা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দায় রূপান্তরের পথ উন্মোচন করবেন এই কামনা করে গ্রন্থের ইতি টানছি। আর সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নয়।

আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট আমাদের দেহের এসব অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিশৈলির উপর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তাঁর মা'রিফাত হাসিলের পথ উন্মুক্ত করে দিন। তাঁর পবিত্র নামের জিকিরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন এবং দেহ-তন-মনে একাগ্রতা সৃষ্টি করে দিন যাতে নামায ও ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ খুলে যায়। আমীন।

সমাপ্ত